BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

নূহর নৌকা

বাণী বসু

প্রাক্ত কুয়ো

জায়গাটা নির্জন। ডালপালা মেলে কিছু গাছ বসবাস করে। যেমন একটা বুড়ো অশথ। ঋতুতে ঋতুতে যার ছোকরা সাজবার, টেরি ঘোরাবার সাধ যায়। ডুমুর গাছটা উঠে ছিল প্রথম পাঁচিল ফাটিয়ে। আরও তুবড়ে গেছে পাঁচিল, কিন্তু তার ইট বেয়ে বেয়ে ডুমুর পেয়ে গেছে তার পায়ের তলার মাটি। বড় বড় খসখসে পাতাগুলো বুড়ো হয়ে গেলে ঝুপঝাপ করে নীচেই পড়ে। বৃষ্টিতে ভিজে, পোকা পতং এর সঙ্গে মিলেমিশে রোমশ মাটি তৈরি করতে থাকে, তার ওপরই ডুমুরের বাড় বাড়ন্ত। বনতুলসীর একখানা ঝোপ রে রে করে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে একখানা থেকে দশখানা হয়ে গেছে। কোথায় তার শুরু, কোথায় শেষ বোঝা দায়। তুলসী মঞ্জরীর সোঁদা সোঁদা বুনো গন্ধে ভারী হয়ে থাকে হাওয়া। এরই মধ্যে আছে দাগড়া দাগড়া শিরকাটা পাতার এক আদ্যিকালের গুলঞ্চ। ক্বচিৎ কখনও ফুল ধরে। তাতেই তার গুমোরে মাটিতে পা পড়ে না। এবড়ো খেবড়ো মাটি আঁকড়ে থাকে শিয়ালকাঁটা, পাথরকুচি, দুব্বো ঘাস।

সে এখানেই ছিল। জ্যামিতিক বিন্দুর যেমন দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ নেই তবু সে আছে, তারও তেমন জল নেই, পাড় নেই, ব্যবহার নেই তবু সে ছিল। যে যেখানে থাকে তার কিছু কাজ, কিছু দায়ও থাকে। অশথটা ঝিলিমিলি আলোছায়া দেয়, নতুন ফাগুনে পাতায় পাতায় শ্যামকাঞ্চন বাহার দেয়, শুঁয়োপোকা লাগলে লোকে দুদ্দাড় করে ছুটে এসে গোছা গোছা ডুমুর পাতা নিয়ে যায়, শুঁয়োলাগা গায়ে ঘষলেই শুঁয়োগুলো উঠে আসবে, এমনই তার গুণ। ডুমুরও পেড়ে নিয়ে যায় লোকে, রেঁধে খাবে। তুলসীর পাতা নেয় মুঠো মুঠো, সর্দি কাশিতে কাজে লাগে, তুলসী নির্বিকারে দিয়ে যায়, ভারী একটা আত্মপ্রসাদ তার। গৌরব। অফলা গুলঞ্চটার অবধি আঁকাবাঁকা ডালে কেমন অনৈসর্গিক চিত্ররূপের বাহার! কোনও এক বছরে প্রচুর হলুদগর্ভের ফুল সে ফুটিয়েছিল, ভবিষ্যতেও ফোটাবে বলে হৃষ্ট হয়ে আছে। শুধু তারই প্রশ্ন প্রখর রোদের টান ওঠা গ্রীষ্মের আকাশের দিকে চেয়ে।

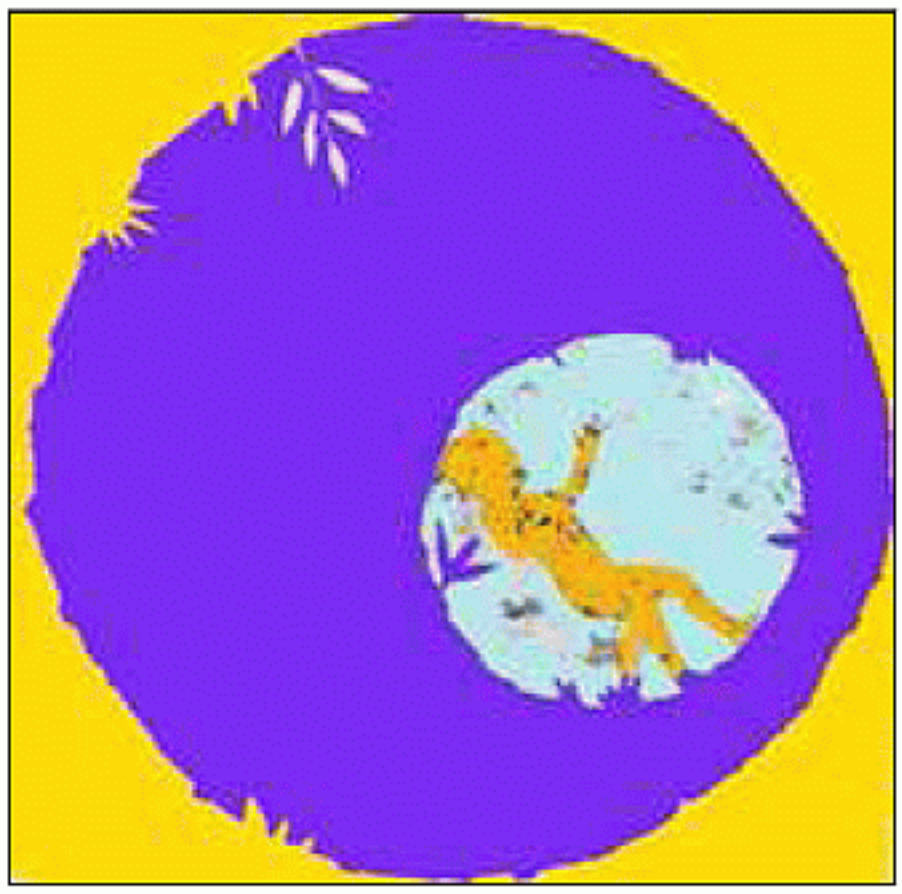

রোদ বলে— আমি খুঁড়িনি হে, আমায় শাপান্ত কোরো না।

আকাশ বলে— রোদে জলে আমার বুক বারো মাস ভেসে যায়, সে কি আমার দোষ? তার

উৎপত্তি প্রকরণ আমি কি কিছু জানি?
গ্রীষ্ম বলে— দিনে আসি রাতে যাই, কারও কথায় আমার কাজ নাই।
কত গভীর করেই না খুঁড়েছিল। খুঁড়তে খুঁড়তে পাতালে পৌঁছে গিয়েছিল, বাসুকি নাগের র াজ্যে। নাগ গর্জন করে বলেন— জল নেই, খুঁড়ো না, ফিরে যাও।
— কিন্তু এ তো নিয়মের বাইরে নয় নাগ। পাতালপ্রদেশে জল থাকে, মাটির আঁশ আঁট কাঁকরের বড় ছোট নানান স্তর পেরিয়ে জলের ধারা চুঁইয়ে চুঁইয়ে সে তোমার রাজ্যেই স্বচ্ছ অমল সলিল হয়ে জমা হয়।
— হত, হচ্ছে না। পাতাল রাজ্যে হাহাকার। আশে জল পাশে জল, জল আমাদের রসাতল, তো সেই অতলান্তিকে টান পড়েছে হে। ফেরত যাও।

তবু খন্তারা ফেরে না। তখন ক্ষ্যামা ঘেন্নায় বাসুকি এক আঁজলা জল দিয়েছিলেন। সেই এক অঞ্জলি এখনও তার হৃৎ প্রদেশে জমা আছে। সযত্নে রেখেছে। বর্ষাবাদলে একটু বাড়ে, গ্রীষ্মে উবে যায়। পড়ে থাকে যোগ বিয়োগের শেষে নিট ফল সেই আদি এক অঞ্জলি জল। তাতে পাতা ঝরে, পাতা পচে, ঘন সবুজ কালচে মতো শ্যাওলাদাম, তলায় ভিজে মাটিতে থকথকে গোড়ালি ডোবা কাদা। তাতে উই চিংড়ি, জলমাকড়, ব্যাং ব্যাঙাচির ফরফরানি, পাঁকাল কালো শ্যাওলাগহন বুক আর মুখ, যা হৃদয় তাই-ই তার নয়ন, তাইই শ্রবণ, এমন এক এ পাঁচ পঞ্চেন্দ্রিয় নিয়ে সে প্রশ্ন উঁচিয়ে জেগে থাকে গোল নীল রুটির মতো দৃশ্যমান আকাশটুকুর দিকে মুখ করে।

বেড়াল লাফিয়ে নামে শব্দহীন পায়ে। পার হয়ে যায় সা নির্জন, মনুষ্য সংসারের পাঁচিলে আলসেয় ঘোরাফেরাই তার স্বাস্থ্য বজায় রাখে। নেড়ি কুকুর তুরতুর করে দৌড়ে যায় শুকনো পাতায় খড়খড় শব্দ তুলে। তুলসীঝোপের পাশটাতে তার আঁতুর, কুঁই কুঁই করতে করতে সেখানেই সে ঝুলিভর্তি বাচ্চার জন্ম দেয়। কামড়াকামড়ি, মারামারি, রঙ্গভঙ্গ গড়াগড়ি, সে বেড়াল বলো, কুকুর বলো, ইঁদুর ফড়িং সব বাবাজির জীবলীলা অবাধে চলতে থাকে এই ভূমির ওপর। এই সব ইতর জীবনের চলাচল, শব্দবর্ণগন্ধ — সবই সে টের পায়। কিন্তু তার কাছে কিছু চেয়ে কেউ আসে না। অশথ, ডুমুর, তুলসীদের কাছে প্রাণীর প্রার্থনা আছে, তার কাছে নেই কোনও প্রত্যাশা, কোনও প্রার্থনা। এবং এ তার এক রহস্যময় অহেতুক ভয়ও বটে। যদি গহ্বর দেখে কেউ তেষ্টা নিয়ে আসে? যদি বলে, জল দাও। স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে ভয়ের শিহরন বয়ে যায়, লজ্জার। শিহরন বেয়ে বেয়ে মাকড়সারা উঠতে থাকে লম্বা সরু শনের ফেঁসোর মতো ঠ্যাং এ, ইঁদুর হেঁটে যায় ছাতা হাতে সার্কাস মেয়ের মতো, ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে পার হতে থাকে গিঁটের পর গিঁট। এবং গভীর রাতে কটু গন্ধে ভরে যায় তার চার পাশ। অন্ধকারে অগ্নিমুখ জ্বলে নেভে, জ্বলে নেভে। অজ্ঞান অন্ধ তিমিরে গা মিশিয়ে নেশা করে রোগা রোগা, হনু জাগা, চোয়াল সর্বস্ব গেঞ্জি লুঙ্গি। শিঁটকে যায় সে। কুকুর বেড়াল আদি যতেক প্রাণী তো মলমূত্র ত্যাগ করছেই, মানুষও বাদ যাচ্ছে না। জল বাতাস আলো রোদ শুষে নিচ্ছে যা পারছে, বাকিটুকু মাটির দায়। বর্ষাকালে আরও সবুজ, আরও সরস হয়ে উঠবে। কিন্তু এই কটু গন্ধের তরল বাষ্পীয় নেশা দ্রব্য মাটি নেয় না। বায়ু প্রত্যাখ্যান করে। তাই দশগুণ হয়ে সে ঝাঁঝ পাক খেতে থাকে তার বদ্ধ বাতাসে। সে হাঁপিয়ে ওঠে, ককিয়ে ওঠে। কেননা, সে এক নিষ্ক্রিয়, নিষ্কর্মা কুয়ো, যে কোনও দিন জল দিতে পারেনি বলে তার পাড় আধ বাঁধাই রেখে লোকে চলে গেছে।

জায়গাটা কিন্তু বনজঙ্গল নয়। গ্রামগঞ্জও নয়। খুঁজতে জানলে শহর বাজারের আনাচে কানাচে কিছু কিছু এমন পোড়ো জমি পাওয়া যায়। আশে বাড়ি, পাশে বাড়ি, একতলা, দোতলা, ফ্ল্যাটগুচ্ছ, বড় বাড়ি, ছোট বাড়ি, টালিচাল, খোলা চাল, গা ঘেঁষাঘেঁষি ঘোঁট এক, দলা পাকিয়ে রয়েছে একেবারে অপরিকল্পিত। বাড়িগুলোর পেছন বাগে পকেটে আধগোঁজা রুমালের মতো এলোমেলো পড়ে থাকে ক্ষেত্রফলের হিসেবের বাইরের কোনাচে, আঁকা বাঁকা জমি। হিসেব করে যার মালিকানা শেষমেশ সাব্যস্ত হল, ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে একটু পাঁচিল দিল কি না দিল, কোণে কোণে থাম গেঁথে রাখল। তার পর জমি প্রকৃতি ও প্রাকৃত জনের খপ্পরে। কে জানে হয়তো জমির জমিদার সব দরকারের মূল দরকার জল বুঝে সর্বাগ্রে কুয়োটাই খুঁড়তে গিয়েছিল। জল না পেয়ে আর দালানটা তোলেনি। কালে কালে লোকে ভুলে যাক জলহীনতার কথা, তখন ভাল দামে বেচবে।

এরাও কিন্তু কংক্রিট জঙ্গলের এক ধরনের ফুসফুস যন্ত্রই। তাই গুল্টু, প্যান্তা, মাকু, গনারা গুলতানি করতে এখানেই আসে। নেশার আসর, জুয়োর আসর। কিছু পাতি লাভার এবড়ো খেবড়ো পাঁচিলের ধার বুঝে তোয়ালে পেতে বসে, ফুসফুস গুজগুজ, গোলাপায়রার মতো ঠোঁটে ঠোঁট বুকে বুক ধুকপুক কিছুক্ষণ তাক বুঝে। তার পর সরে যায়। পোড়ো। যতই পোকা পাখি, জন্তু জানোয়ার, নেশাড়ে, লাভাড়ু আসুক মোটের ওপর পোড়ো জমিতে একখানা পোড়ো পাতি কুয়ো, যার এক আঁজলার বেশি মুরোদ নেই।

জলজ্যান্ত হয়ে থাকার যখন উপায় নেই তখন তার গরজ কী? সে ঝিমিয়ে থাকে। চার পাশে যা ঘটছে ঘটুক। বেড়ালে বিয়োক, কুকুরে পেচ্ছাপ করুক, মানুষে ফুঁকুক, তার এ দিকে ও দিকে যে সব বাড়ির খিড়কি, সেখান থেকেও কি কলহবিবাদ, তুলকালাম ভেসে আসে না? পুরুষ গলায়, মেয়ে গলায়, বুড়ো গলায়? করুক করুক, যার যা ইচ্ছে করুক গে, মরুক গে যাক। তার বুকে তো আকাশটুকুও ছায়া ফেলে না। শুকনো, পাতি, বাপে তাড়ানো, মায়ে খ্যাদানো নিমুরুদে কুয়ো একখানা! বিশ্ব সংসারের কোথায় কী ঘটছে না ঘটছে, তাতে তার কী এলো গেলো? তাই যখন নিশুত রাতে কোথাও একটা আর্তনাদের মুখ চেপে ধরল কেউ, সে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বুঝল ঠিকই, একটা অসৈরন কিছু ঘটছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কিছু পরেই ধুপধাপ। বাঁদরের না মানুষের পায়ের শব্দ ঠাহর হয় না। গুমসোনি গোঙানি। তার ভাঙা পাড়ের কাছে দুর্গন্ধ শয়তানি জটলা একটা, তীক্ষ্ণ শিশুগলার চিৎকার, তার পরেই বদ্ধ বাতাস তোলপাড় করে। কাদা কাজল বাসুকিদত্ত সেই এক আঁজলা জলে ধুপ করে কিছু একটা পড়ল। খুব দামি জিনিস সে বুঝল। শিশু একটি। কান্না অচিরেই থেমে যায়। সে কাঁটা হয়ে ছিল, কিন্তু বুঝে যায় একেবারে কোলটিতে পড়েছে সে হাঁটু গেড়ে, কাদায় পুঁতে গেছে তলাটা। পড়ে আর ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে, নেতিয়ে গেছে বাবুটা। এমন অদ্ভুত ঘটন তার জীবনে আর কখনও ঘটেনি।

একটা গলা বলল— যাঃ, নিশ্চিন্ত।
আকাশ উধাও। তিন চারটে মুণ্ডু ঝুঁকে পড়েছে। ভাল হয়েছে স্বচ্ছ সলিল নেই। সে ক্ষেত্রে শয়তানি বিম্ব ধরতে হত তাকে চার চারটে। হাত ঝেড়ে ঝুড়ে সব চলে গেল ভারী ভারী পায়ে।

সকালবেলায় থানা পুলিশ ছয়লাপ। লোক ভেঙে পড়েছে বাইলেনের সরু পরিসরে ৫/১ নম্বরের উঠোনে, রোয়াকে। কার্তিক সামন্ত মশাইয়ের নাতিকে মাঝরাতে তুলে নিয়ে গেছে জনা কয়েক মরদ। পাঁচিল টপকে ঢুকেছিল। উঠোন, দাওয়া, ঘর ঘরালি তাদের বিলকুল চেনা, তা নয়তো কোণের ঘরে দাদুর কাছে ছোট্ট নাতি ঘুমোচ্ছে, সে ঘরের দরজা বন্ধ করলেই কাঁদে, এ সব কথা তারা জানবে কী করে? ঠাকুমার কাছে নাতি শোয়। কিন্তু দু'আড়াই বছরের বাচি দাদুর কাছে, একটু আলাদা রকম না? অন্ধকারে তাঁর পাঁজরের কাছে খোঁচা লেগেছিল। চাঁদ আড়াল করে মানুষের মুণ্ডু — কে? কে? — দরজা দিয়ে ততক্ষণে চম্পট দিচ্ছে কেউ কেউ। শিশুটির মুখে হাত চাপা। একটা ঝিম ধরানো মিষ্টি গন্ধ তাঁর নাকে ঠেসে ধরছে কেউ। তাঁর জ্ঞান লোপ হয়। তবু তাঁর মনে আছে তাঁর চিৎকারে ছেলে বউয়ের ঘরের দরজা খুলেছিল। এখন শুনছেন ঘরের ভেতর তারা রক্তমুখী লাশ হয়ে আছে। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন বৃদ্ধ।

ভোরের আলো ফোটার পরে সদর খোলা পেয়ে গোয়ালা দেখে ঘরে ঘরে শেকল তোলা। সেই গিয়ে পাড়ার লোক ডেকে আনে। কিছু খোয়া যায়নি। সামন্তর বালিশের নীচে সিন্দুকের চাবি, লকারের চাবি সব যেমন কে তেমন। খালি ছেলে বউ খুন। একমাত্র নাতিটি গায়েব।

পুলিশ ছবি তোলে। মাপজোক নেয়। আর তার পরেই হামলে পড়ে বুভুক্ষু খবুরে লোকেরা। কেউ ছেপে বের করবে, কেউ চলচ্ছবি তুলে বয়ান দেবে। টেলিভিশন, খবরের কাগজ উপুড় হয়ে পড়েছে ডেডবডিগুলোর ওপর। বেবাক বৃদ্ধটির ওপর। সে ভদ্রলোকের ঘোর কাটছে না। মাথার ভেতর ভোঁ ভোঁ শব্দ হচ্ছে যেন। হঠাৎ তিনি ডুকরে ওঠেন, কী যে বলতে চান ভাল বোঝা যায় না। সেই বোবা আর্তনাদের টিকা টিপ্পনী বার হতে থাকে নানান রকম।

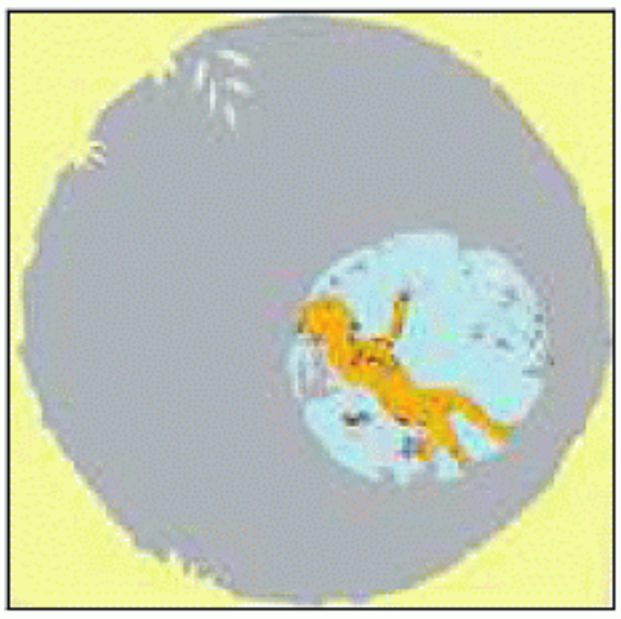

— বুড়োটাকে বাঁচিয়ে রাখলি কেন বাবা। যা চাইতিস তাই না হয় দিয়ে দিতুম রে মেধো! জোয়ান ছেলে বউ আমার...দুধের ছেলেটা...কথা হারিয়ে গেল বৃদ্ধর। 'মেধো' অংশটুকু পড়ে ফেলল পুলিশ এবং অনেকেই। কে এই মেধো? এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দিল জনতা। মেধোরা চার মস্তান, এ তল্লাটের সন্ত্রাস। তোলাবাজি প্রধান কাজ, ড্রাগ বিক্রি দ্বিতীয়। শাসানি হুমকি ইদানীং বেড়েছে। এইটুকু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই।

বিলাপের শেষের অংশটুকু যার কানে ইয়ার প্লাগের মতো আটকে ছিল, সে শশাঙ্ক। পদবী নিষ্প্রয়োজন। ছ' ফুটের সামান্য বেশি লম্বা, ছত্রিশ ইঞ্চি বুকের হিলহিলে ফ্যাকাশে ফর্সা অনতিযুবক এক। খ্যাতনামা কাগজের রিপোর্টার। দু দু'বার পুরস্কার পেয়েছে। ইনভেস্টিগেটিভ

জার্নালিজমে তার দক্ষতা বিস্ময়কর। কিন্তু তার নিয়ন্তাদের নিশ্চয় কিছু অসুবিধে ছিল। তাই বেশ দীর্ঘ সময় তাকে রাজনৈতিক রিপোর্টিং এ চালান করা হয়েছিল। তার যোগ্যতার লোক তো তাইই যায়। গণনেতারা বাইরে গেলে সার্ক সম্মেলন কী ইউ এন এর কনফারেন্স, ইউনাইটেড স্টেটসে বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক কী পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি প্রয়াস...। শশাঙ্কর কাছ থেকে টেবিলাতিরিক্ত অন্দরের খবর পাওয়া যেত। নেতাদের চোখ মুখের ভাষা পড়তে যথেষ্ট কেরামতি দেখিয়েছে সে। কিন্তু ইদানীং সে এ ব্যাপারে তার চিফের কাছে অব্যাহতি চেয়েছিল। তার ক্যালির লোক আবার ফিরে এসেছে রহস্যময় খুন জখম, অপহরণ ইত্যাদির আসরে।

তাকে বলা হয়েছিল— আগেরটা অনেক আরামের এবং নিরাপদও, যদি না প্লেন হাইজ্যাক হয় বা মন্ত্রী মহাশয়দের লোপাট করতে গাড়ি বোমা টোমা ব্যবহার হয়। সম্মান বেশি তো বটেই। শশাঙ্ক জানে, কিন্তু আর করবে না। পুলিশের কুকুরের মতো অকুস্থল শুঁকে শুঁকে অপরাধের নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করাতেই যেন তার কেমন একটা অসুস্থ উৎসাহ।

শশাঙ্ক দাঁড়িয়েছিল শেষ প্রান্তে। লম্বা বলে তার কিছু বাড়তি সুবিধে আছেই। 'দুধের ছেলেটা' শুনতে পেয়েই তার খবরের নাক কান সক্রিয় হয়ে গেল। দুটি খুন, একটি শিশু উধাও— গুরুত্বের দিক দিয়ে কোনটা প্রায়রিটি পাবে? শশাঙ্কর ব্রেন বলল— খুন যারা হয়েছে তাদের তো হয়েই গেছে। কিন্তু শিশুটি কোথায় গেল? খুনের গন্ধে গুড়ে মাছির মতো আটকে পড়া কাগুজে লোক ও পাড়াপড়শির ভিড় থেকে আলগা হয়ে সে খোঁজ করতে লাগল দুধের শিশুটি কে?

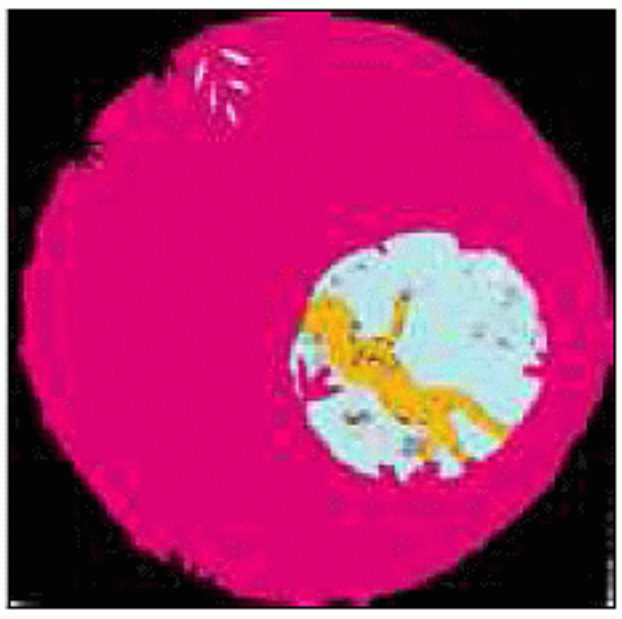

উত্তর জোগাড় হল এই রকম— সামন্তরা ব্যবসায়ী পরিবার। কাপড়ের দোকান, বড় মনোহারী দোকান, আটা চাক্কি, ইলেকট্রনিক গ্যাজেটসের দোকান, রেশন দোকান ইত্যাদি অনেক কিছু আছে এদের। ছোট গণেশ মারা গেছেন। তাঁর ছেলেপুলেরা ৫ /২ এ থাকে। কার্তিক সামন্তর ছেলে কানাই সামন্তকে তার স্ত্রী সহ খুন করে গেছে কেউ। তাদেরই ছেলে আড়াই বছরের চিনচিন। খুব মিষ্টি বাচ্চা, দু পরিবার তো বটেই, সবাইই তাকে খুব ভালবাসে। একটু চিনে চিনে দেখতে। পাড়াতে অবাধে খেলে বেড়ায়। কে তাকে নেবে? কেনই বা?

কে, কেনর থেকে কোথায় টাই শশাঙ্ককে বেশি ভাবাতে লাগল। যারা তার মা বাবাকে খুন করেছে তারা তাকেও খুন করেনি কেন এটা একটা বড় প্রশ্ন। কিন্তু তাদের হাতে তো সে খুব নিরাপদও নয়।

এই সময়ে ইলেকট্রিক শকের মতো কিছু একটা তার মগজে ধাক্কা মারল। সে আস্তে আস্তে একেবারে বাইরে বেরিয়ে এল। কোথা থেকে একটা সংকেত আসছে, তার অ্যানটেনা সেটা ঠিকঠাক ধরতে পারছে না। তার এ রকম হয়। তার লাইনে এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টা খুব জরুরি। একটা থিয়োরি গড়ছে ভাঙছে। শিশু গায়েব। বৃদ্ধ বেঁচে, যুবক যুবতী খুন। খুন, অ্যাবডাকশন দুই-ই। সে ভীষণ চঞ্চল বোধ করছে। শিশুটির খোঁজ চাই। মুক্তিপণের জন্য যদি সে অপহৃত হত, তা হলে তার মা বাবা খুন হল কেন?

রোদ চড় চড় করে বাড়ছে। পুলিশ বডি নিয়ে চলে গেছে। কার্তিক সামন্তকে তাঁর ছোট ভাইয়ের বাড়ির লোকেরা হাত ধরে ও বাড়ি নিয়ে গেল। এ বাড়ি পুলিশ সিল করে দিচ্ছে। পাহারা বসছে। দুটো নাগাদ পুলিশ কুকুর মিলখা আর বেটি এসে গেল। চরকি ঘুরছে অ্যালসেশিয়ান দুটো। ভার ী কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বাঘের মতো চেহারার মিলখা মাটি শুঁকছে, এগিয়ে যাচ্ছে। পেছনে পেছনে বেটি। পুলিশ জনতাকে ঠেকিয়ে রাখছে। কিন্তু ধার দিয়ে দিয়ে তারা এগোচ্ছেই। সোজা সড়ক দিয়ে ছুটে গিয়ে মিলখা আরও এগিয়ে যায়। তরুণী বেটি যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত। সে কি ডান দিকে ফিরতে চায়? মিলখার প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে বেটি যেন পরাজিত। শশাঙ্ক ডান দিকে বেঁকে গেল। গলি একটা। ইটপাতা। দু'পাশে মফস্‌সলি চেহারার বাড়ি সব। গলিটা গিয়ে পড়েছে পেছনের সড়কে। সড়কের ওধারেও ছাড়া ছাড়া বাড়ি, মাঝে ডোবা কচুরিপানায় আটক। ঘোরাঘুরি করে অ্যানটেনা ব্যর্থ হওয়ায় চিন্তিত মুখে সে অফিসে ফিরে গেল, রিপোর্ট তৈরি করে দিল। তার পর বাড়ি ফিরে গেল। একেবারেই আনমনা।

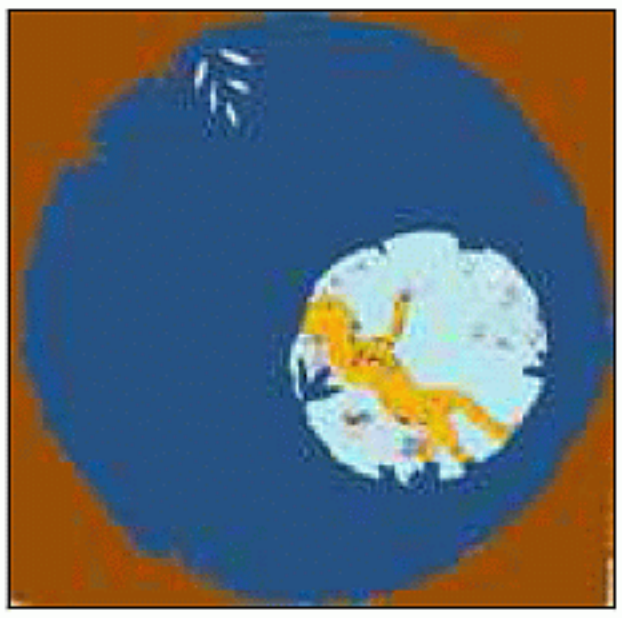

তখনও চার দিকে ঘষাকাঁচ অন্ধকার। কুয়ো তার তরঙ্গ পাঠাচ্ছিল প্রাণপণ। তরঙ্গগুলো কুয়োর গোলাকৃতি মুখ পর্যন্ত ঝটিতি উঠে এসে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছিল চার দিকে। রাতের কুকুর তার চার পাশ ঘিরে ডেকে ডেকে ফিরে গেছে। রাতপাখি তীব্র গলাচেরা ডাক ডেকেছে, অশথ ডুমুর গুলঞ্চ তুলসী স্তব্ধ কাঁটা হয়ে ছিল সারা রাত। এখন ভোর কুয়াশায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্র মশ। ইমপ্রেশনিস্ট ছবির মতো। শশাঙ্ক এসে ঢুকল, হাতে জোরালো টর্চ।

সারা রাত সে ঘুমোতে পারেনি। মগজের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা তার পিড়িং পিড়িং করে কেঁপে গেছে। শিউরে শিউরে উঠেছে রগের কাছটা। ভোররাত্তিরে বিছানা ছেড়ে চটপট তৈরি হয়ে ট্যাক্সি নিয়ে সে চলে এসেছে। এই তো দুই বাড়ি ৫ /১, ৫ /২। সামনে বাইলেন এসে পড়েছে বড় রাস্তায়, রাস্তা ধরে চলে যাও দক্ষিণমুখো। এইখানে ডাইনের বাঁক, ঘোরো। পৌঁছও এসে ইটপাতা রাস্তায়। এটা গিয়ে পৌঁছেছে বড় রাস্তার সমান্তরাল একটা খিড়কির রাস্তায়। বদ্ধ ডোবা, জলাশয়, কাঁচাবাড়ি, পাকাবাড়ি। দু'তিন বাড়ির মাঝে গোঁজা আধভাঙা পাঁচিলে ঘেরা পোড়ো জ মিটা সে পেয়ে যায়। রগ লাফাচ্ছে এখন। পাঁচ-ছটা এলোমেলো গাছ। তুলসীর গন্ধে ঝিম ধরে আছে। নেড়িকুত্তার বিষ্ঠা, আধলা ইট আর দুব্বো ঘাসের ঠাস বুনোট জালে ঠোক্কর খেতে খেতে সে কুয়োর পাড় অবধি পৌঁছয়, এবং তার পরেই সেই গহ্বরের ভেতর থেকে পাক খেতে খেতে উঠে আসে কান্না। খুব ক্ষীণ। মানব শিশুর নাও হতে পারে। কুয়ো তাকে প্রবল টানে টেনে ধরে। শশাঙ্ক কিনার থেকে মুখ বাড়িয়ে টর্চের আলো ফেলে। জোরালো আলো অন্ধকার ফুঁড়ে ছুটে যায়। একটি ছোট্ট মাথা, নগ্ন পেট ও দুটি ছোট ছোট হাত। খুব আবছা তবু চেনা জিনিস। মনুষ্য শাবক। ঝট করে হাতে উঠে আসে সেলফোন। পুলিশ এবং দমকল। কাদামাখা পোকায় কাটা, ইঁদুরে খাওয়া, মৃতপ্রায় শিশুটি হাসপাতালে চলে যায় দ্রুত।

কেন সে জলহীন, কেন তার গর্ভে দশ বারো আঙুল মসমসে শ্যাওলার গদি, সাটিনের মতো পাঁক। কেন তালপুকুরে ঘটি ডোবে না জল — সমস্ত বুঝে স্তব্ধ থাকে সে। পার্থিব নিয়মকানুনের ছকখানায় যে সব কিছুরই একটা উদ্দেশ্য বিধেয় আছে, এমনকী তার আপাত অর্থহীন অস্তিত্বের ও একটা মানে একটা নির্দিষ্ট কাজ ছিল, এই কথাটা হৃদয়জাত করে রোমহর্ষ হয় তার এবং সেই ভূখণ্ডে সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের জন্য অতঃপর যে পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়, তার মধ্যেও সে শান্ত, ধীর স্থির, যাকে বলে স্থিতপ্রজ্ঞ থাকে।

নূহর নৌকা

বাণী বসু

একাকিনী

বিকেল ছ'টা নাগাদ দরজায় চাবি ঘোরাবার শব্দ হয়। বেশ বড় অনুপমা হাউজিং এস্টেটের চত্বর টা। টালিগঞ্জ অঞ্চলে এ রকম অনেক গড়ে উঠছে। আসুন আসুন, ফ্ল্যাট বিক্রি আছে। শুধু ফ্ল্যাট নয়, মর্নিং ওয়াকের রাস্তা, বসে হাওয়া খাওয়ার পুকুর, সাঁতারের পুল, ক্লাব। আসুন, উন্নত মানের জীবনযাত্রার জন্যে। শিগগিরই হবে হেল্‌থ ক্লাব, বিউটি ক্লিনিক, মন্তেসরি স্কুল, ক্রেশ...। একটা ছোটখাটো স্বয়ংসম্পূর্ণ টাউন আর কী! মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত আর অত্যুচ্চবিত্ত তিনটি শ্রেণি। শ্রেণিবদ্ধ সমাজ। যতই জাতপাত তুলে দেওয়া যাক না কেন, আদি অকৃত্রিম ধনী দরিদ্র শ্রেণি, তাদের মধ্যে আরও অনেক স্তর, বিভিন্ন স্তরে আদান-প্রদানের অভাব, কারও হীনম্মন্যতা, কার ও উচ্চম্মন্যতা— এ আছেই। উচ্চবিত্ত অর্থাৎ হাই-ইনকাম গ্রুপ ফ্ল্যাট দুটো পাশাপাশি। এ-ফ্ল্যাটে চাবি ঘোরালে ও-ফ্ল্যাটে আওয়াজ হয়। ও-ফ্ল্যাটে জানলা বন্ধ করলে এ-ফ্ল্যাটে শোনা যায়। তাই পাশের ফ্ল্যাটের দরজা নিঃশব্দে খুলে যায়। একটি শ্যামল মুখ, একজোড়া উজ্জ্বল চোখ দেখা যায়।

—আজ এত তাড়াতাড়ি দাদা!

—ও-ই!... শশাঙ্ক বলে, না তাড়াতাড়ি নয়। বরং সে প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরছে। কালকে রাতে আসাটা আসাই নয়। এত কথা বলার মানুষ সে নয়। তার এড়ানো জবাবে (ময়েটির মুখ সামান্য ম্লান হল সে কি বুঝতে পারল? বলল— লোটনের ফোন এসেছিল নাকি? কঙ্কণাও বেশি কথা বলতে চায় না। সে পারে। তার ইচ্ছেও করে। কিন্তু যে যে-রকম তার সঙ্গে সে-রকম চলাই ভাল। তাই সে সংক্ষেপে বলে— না।

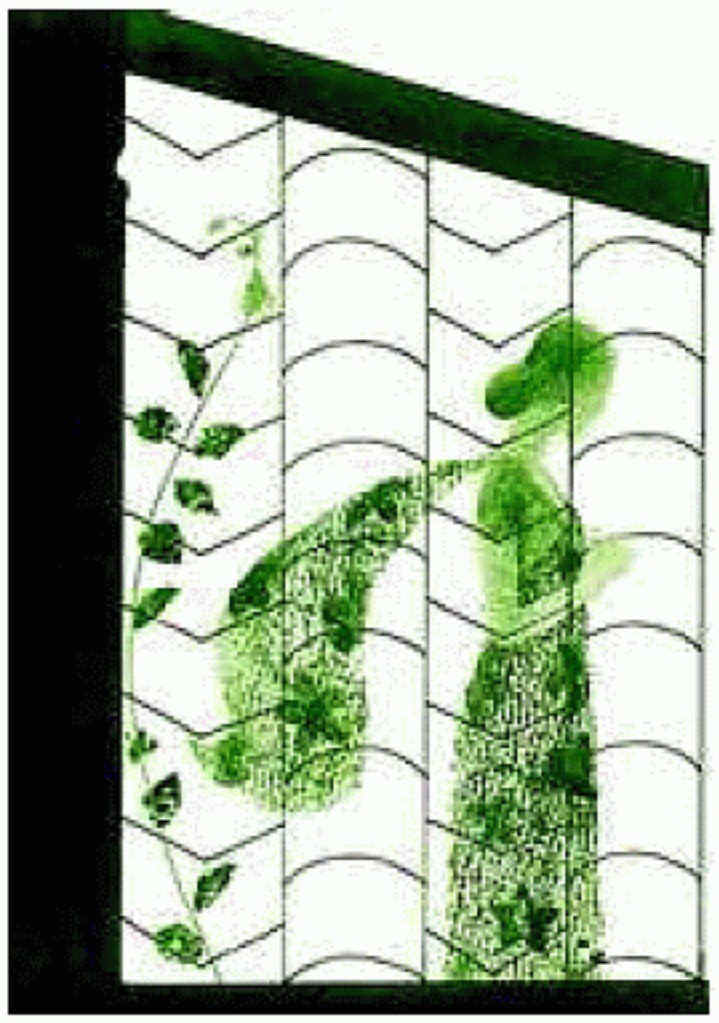

শশাঙ্ক ঢুকে যায়। দরজাটা বন্ধ করে দেয়। এখন তার কারও সঙ্গে গপ্পো করবার মন নেই। কখনওই বা থাকে! নেহাত আনমনে সে চান-টান করে, জামা-কাপড় ধোপার বাক্সে ফেলে দেয় এবং পাজামা-পাঞ্জাবি গলিয়ে নেয়। শোওয়ার ঘরে যায় না। বাইরের ঘরে একটা ডিভানের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, চোখের ওপর আড়াআড়ি একটা হাত রাখে যেন আলো আড়াল

করছে। অথচ আলো সে জ্বালেইনি। জানলা দিয়ে বাইরের আলো যেটুকু আসছে তা বিরক্ত করবার মতো নয়। কেমন একটা ঘুম আর জেগে থাকার মাঝামাঝি অবস্থায় অনেকটা সময় কেটে যায়। রক্তগঙ্গা বয়, সমস্ত স্মৃতি সত্তা জুড়ে, দুটি নরনারীর মৃতদেহ শুয়ে থাকে, বয়স্ক মৃতদেহ, তার জনক-জননী, তার ওপরে আরোপিত হয় আরও দুটি লাশ, যুবক-যুবতীর। এরাও জনক-জননী, একটি শিশুর। অনিচ্ছাকৃত পেশি কম্পন হয় শশাঙ্কর সারা শরীরে, সে অস্ফুটে বলে ওঠে, না না না।

তার পরই তার দরজায় বেল বাজে। রাতের খাবার নিয়ে এসেছে কঙ্কণা। এই ব্যবস্থাটা সে পছন্দ করে না আদৌ। কিন্তু তার বাড়ি থাকা, ফেরার সময় এতই বেঠিক যে, এই রুটিনের সঙ্গে মিলিয়ে কোনও রান্নাবান্নার লোক পাওয়া যায় না। কঙ্কণার কাছ থেকে চাবি নিয়ে তারই ব্যবস্থাপনায় পরিষ্কৃত হয় বলেই তার ফ্ল্যাটটা বাসযোগ্য আছে, তার বিছানাপত্তর শোওয়ার যোগ্য, তার জামা-কাপড় পরার যোগ্য আছে। সে এগুলো কোনওটাই পছন্দ করে না। কিন্তু বেশি না না করতে পারে না, তাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। হোম সার্ভিসে বলে যে খাবার আনিয়ে নেবে, সেটাও সব সময়ে হয়ে ওঠে না। কেননা, তাদেরও সময়মত জানানো চাই। ঢুকতেও পার তে হবে। কঙ্কণার কাছে চাবি তো থাকেই, যে ভাবে ঘর পরিষ্কার হয়, সে ভাবেই খাবারও এসে যেতেই পারত। কিন্তু কঙ্কণা খুব দৃঢ় গলায় জানিয়েছে— এটাও তো হোম সার্ভিসই, না কী? দা মটা দাদার ইচ্ছে হলে দিয়ে দেবেন। ৩৫ টাকা ফিশমিল, ৪০ টাকা চিকেন। ৪৫ টাকা মাটন, নিরামিষ ৩০ টাকা। এই ভাবে দামের তালিকাও সে গড়গড় করে বলে গেছে। মুখ গম্ভীর। ফাজলামি করছে কি না বোঝবার উপায় নেই।

কঙ্কণার একটা মূল প্রশ্ন আছে। গৃহকর্মনিপুণা সুশ্রী রমণীই তো বিয়ের পাত্রী হিসাবে খোঁজা হয়। গ্র্যাজুয়েট হবে অন্তত, পাঁচটা লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবে। সে তো সেই রক মটাই। ঘর গুছিয়ে মানুষকে যত্ন করে, খাইয়ে-দাইয়ে সুখ পায়। পাশে সে। আপন ভাইয়ের বউ থাকতে শশাঙ্ক কেন সামান্য রাতের খাওয়া বা একটু জলখাবারের ভাগ নিতে এত আপত্তি করে তা তার মাথায় ঢোকে না। সুতরাং সে এখন ক্ষুধার্ত ক্লান্ত মানুষটির জন্য যত্ন করে রুটি, মাংস, ডাল, পটলভাজার গরম গরম ডিনার নিয়ে এসেছে। খাবার দিয়ে কঙ্কণা নিতান্ত অনিচ্ছায় চলে আসে। বসে খাওয়াবার সাধ থাকলেও সে সব এখানে প্রশ্রয় পায় না।

এবং খেতে বসে এত দিনের এত দুর্ঘটনা দেখে দেখে অভ্যস্ত জার্নালিস্টের আজ হঠাৎ প্রবল বমি পেতে থাকে। ছাগমাংসে আর মানুষের মাংসে যেন কোনও তফাত নেই। পটলভাজা একটু ডাল দিয়ে কোনও ক্রমে কিছুটা খেয়ে শশাঙ্ক সব কিছু গার্বেজ বিন-এ ফেলে দেয়।

শহর মানে পাকা রাস্তা। শহর মানে বাড়ি। শহর মানে উপরন্তু প্রচুর যানবাহন, ভিড়, বাজার-দোকান, গোলমাল, কেনাকাটা, যাতায়াত, ব্যস্ততা, যানজট। শহর মানে কলের জল, বিজলি বাতি, রাস্তা সারাই। মূল নকশা একটা আছে ঠিকই, কিন্তু চালু হয়ে যাবার পর এইসান জোর দ ম দিয়ে খেলনাটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে, সেটা নিজের বডির ওপরই উল্টোপাল্টি খাচ্ছে। ছেয়ে রঙের রাস্তাগুলো যানের তলায় কিলবিল করছে। গর্ত-গাড্ডায় হেঁচকি তুলছে। গাড়লের মতো কেশে কেশে ছুটে যাচ্ছে বে-মেরামত সরকারি-বেসরকারি বাস, অটো-রিকশা, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, ট্রাক। হঠাৎ পাখির চোখে দেখলে মনে হবে শহরটা পাগলই হয়ে গেছে বুঝি। সে জানে না কী চায়, কোথায় যাবে। এখানকার কোনও রাস্তা কোথাও পৌঁছয় না, কোনও গৃহে শান্তি নেই, কোথাও কেউ ঘুমোয় না এখানে। সকাল থেকে রাত অবধি ধান্দা, শুধু ধান্দাতেই ব্যয় হয়ে যায় এখানে জীবন। এই দেখাটাই একমাত্র সত্যি না হতে পারে, অন্য রকম নানান দেখাও থাকা সম্ভব। কিন্তু কঙ্কণা তার পাঁচতলার পেছনের বারান্দা যা হাউজিং-এর দিকে পিঠ করে ব্যস্ত সড়কের দিকে মুখ করে ঝুলে আছে, সেখানে জামা-কাপড় শুকোতে এবং তুলতে এসে এই রকমটাই দেখে। সারা শহরে একমাত্র তারই হয়তো অবসর আছে এ ভাবে দেখবার,

ভাববার। সে তো ধান্দাহীন কিনা! নিঃসন্তান গৃহিণী রমণী এক, যার স্বামী মাসের অর্ধেক ট্যুরে কাটায়। নৈর্ব্যক্তিক রাস্তা, গলি, ফটক, কেয়ারটেকার, ব্লক, বি সি, এ সবের দিকে তাকিয়ে কঙ্কণা ভেবে পায় না এত মায়া এত মোহ নিয়ে সে কী করবে! গান শোনে, বইও পড়ে কিছু কিছু। পাড়া-পড়শিদের সঙ্গে গল্প-গাছাও যে নেই, তা নয়। কিন্তু এগুলোর কোনওটাই নিজস্ব কাজ বলে তার মনে হয় না। সে যেন ওয়েটিং রুমে বসে আছে, ট্রেন আসছে না। জীবনটা শুরু হয়েও হচ্ছে না, এমনই মনে হয় তার। তখনই সে চড়ুই পাখির মতো ছটফট করে ওঠে। এক বার পেছনের বারান্দায়, আর এক বার সামনের বারান্দায় ছোটাছুটি করে। মন দিয়ে দেখে অফিস গাড়িগুলো বেরিয়ে গেল। স্কুলবাস দাঁড়িয়েছে প্রধান ফটকের বাইরে, হই হই করে একদল বাচ্চা উঠে গেল, বা নামল। চলমান জীবন দেখে সে। ওই ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়টা সত্যি, না তার এই অকর্মক ঘটনাহীন স্থির থাকাটা— সে ঠিক করে উঠতে পারে না। সবটাই তার খুব অসঙ্গত, সুতরাং অবাস্তব লাগে।

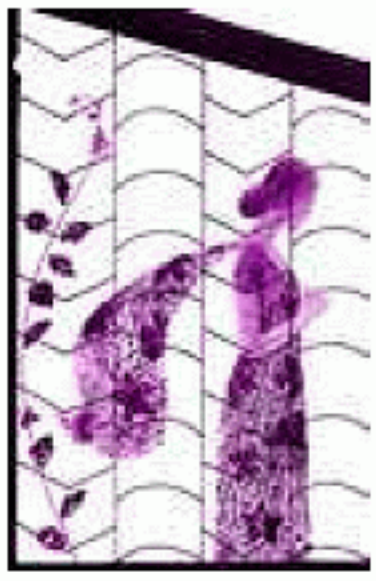

ফ্রক স্কার্ট-পরা দিনকালে লক্ষ্যগুলো ছিল ছোট ছোট। এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে ওঠা। আরও মার্কস পাওয়া, সেলাই আরও নিখুঁত। সাজগোজ আরও পরিপাটি।— এই দেখেছিস ি মতালি ভুরু প্লাক করেছে! কী রকম অস্বাভাবিক ঢাকনার মতো গোলচে হয়ে গেছে! এই যাবি নাকি! জানিস, মুখের মধ্যে ছোট ছোট লোম থাকে বলে কালো লাগে। সেগুলো তুলে দিলেই ফর্সা। যাবি?— এই সব। রবীন্দ্রজয়ন্তী, সরস্বতী পুজো, অ্যানুয়াল সোশ্যাল— এই রক ম ছোটখাটো টিপি-ঢিলা লাফিয়ে পেরনো। ফ্রেশার্সে কোরাস গান, স্বাধীনতা দিবসে প্যারেড। শ্রুতিনাটক...। বিয়ের পরও যদি এই রকম ছোট ছোট শৃঙ্গজয়ের ব্যাপারটা থাকত! শ্বশুর-শাশুড়ি জয়।— মা আপনি বসুন না, আমি আর এক বার চা করে আনছি।... তাতে কী হয়েছে! ননদের প্রেমে সাহায্য।— হ্যাঁ রে! সত্যি কুন্তল তোকে ভালবাসে। বয়সের অল্প তফাতই ভাল, বেশ বন্ধু বন্ধু। আমার তো বাবা কুন্তলকে খুব পছন্দ। ধুৎ, আমার জন্যে কেন, তোর জন্যে তোর জন্যে! ঠাকুরজামাই এলো বাড়িতে, হি হি। স্বামীর আস্থাভাজন হওয়া।— শোনো, আি ম তোমার নামে একটা, আমার নামে একটা লাইফ ইনসিয়োরেন্স করাচ্ছি। শোনো, এয়ারকুলার কিনব, না কন্ডিশনার, ভেবে বলবে। ন্যাচারালি, তুমি যা বলবে তাই হবে..., নিজের বন্ধুদের নিয়ে বেশ আড্ডা। বাড়িতে, বাইরে...। কাঁকনের শ্বশুরবাড়িটা ফ্যানটাস্টিক। যত খুশি গপ্পো মারো চমৎকার, বেগুনি, আলুর চপ এসে যাচ্ছে। স্বামীর বন্ধুদের পছন্দের বউদি হতে পারাটাও একটা লক্ষ্য বই কী! এ রকমটাই তো হয়ে থাকে বলে সে শুনেছে। কিন্তু তার বেলা হল না। দুই ভাইয়ের সংসার। তা-ও আলাদা। বড় ভাই বিয়েই করেনি। এদের মা-বাবা, বোন-টোন কোথাও কেউ নেই। ভালই এক হিসেবে। ভাল বলেই মা-বাবা দিয়ে ছিলেন। কিন্তু কোনও চাঁদ মারি না থাকায় পুরোটাই এক ফাঁকা মাঠ। কী জয় করবে তুমি কাঁকন? কোথায় পৌঁছবে? স্বা মীর বড় ভাইয়ের চাকরির দিন নেই, রাত নেই। আর স্বামী? তার কথা বলে কাজ নেই। অর্ধেক দিন হিল্লি-দিল্লি, চেন্নাই-পুণে। যখন এখানে থাকে সে এক জন আদর্শ স্ত্রীর মতো নিখুঁত সাপ্লায়ার থাকে। কিন্তু মৃগাঙ্ক সেটাকে তার কোনও বিশেষ কৃতিত্ব বলে মনে করে না। পড়ে-পাওয়া চোদ্দো আনা। অথচ, ঠিক এই সুখ তার অজানা ছিল। বোর্ডিং-এ মানুষ, তার ষোলো আনা স্বনির্ভর হওয়ারই তো কথা! যখন বাইরে যায় তেমনই থাকে। শার্ট-এর ভাঁজ, রুমালের গোছ, চাবি, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড সব আলাদা আলাদা খোপে। কিন্তু স্ত্রীর আওতার মধ্যে থাকলেই তোয়ালে গুন্ডুলি পাকিয়ে পড়ে রইল, প্যান্টটা লাথি মেরে এ-দিকে, গেঞ্জিটা চড়চড়

করে খুলে ছুড়ে ও-দিকে, সুখ-সুবিধেগুলো কেমন নির্বিকার ভোগ করে। কোথাও কোনও চমক যেন তার নেই। এ রকম ঘুম থেকে ওঠা মুখে গরম চা পাওয়া বা নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনের আহার, সুন্দর সুগন্ধ বিছানা, চমৎকার ইস্ত্রি করা পোশাক পরিচ্ছদ টিপটপ হাতের কাছে পাওয়া, এটাই যেন স্বাভাবিক।

বাচ্চা-কাচ্চা হলে তার জীবনটা একটা মানে পেয়ে যেত, একটা অভিমুখ যাকে বলে। হল না। দু'বার ফটাস ফটাস করে গর্ভপাত হয়ে গেল। কিছু দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার কথা ডাক্তার বলেছিলেন, মৃগাঙ্কর গা নেই। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষার শাখায় শাখায় শাখামৃগ এখন।

হাতের কাছে এক জনই মানুষকে পায় সে, যাকে কিছু দিলে সে সম্ভ্রমে নেয়, ওটা তার প্রাপ্য বলে হেলাছেদ্দা করে না। কিন্তু চায় না তো! শশাঙ্কও স্বনির্ভর, কিন্তু তার ভাই মৃগাঙ্কর ধরনে নয়। মৃগাঙ্ক একটু বড় হতেই বোর্ডিংয়ে, কেননা তাদের মা-বাবা কোলিয়ারিতে ছিলেন। ম্যানেজার। প্রচণ্ড মাফিয়ার উৎপাত ওখানে। শশাঙ্ক হস্টেলে গেছে। কিন্তু কলেজ-জীবনে। মা-বাবার সঙ্গে স্নেহ ভালবাসা দায়-দায়িত্ব ভাগ করেই তার জীবনের গোড়ার দিকটা কেটেছে। এখনই না হয় কানকাটা সেপাই। কথাটা ওরা আলোচনা করতে চায় না। কিন্তু কঙ্কণা আত্মীয়দের কাছে শুনেছে, এদের বাবা-মা খুন হয়ে যান। মাফিয়াদের হাতেই সম্ভবত। কিন্তু তার কিনারা হয়নি। তার পরই তাদের ধানবাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকল। বাবার সঞ্চয় ও কোম্পানির ক্ষতিপূরণের টাকায় এই দুই ফ্ল্যাট। মৃগাঙ্কর পড়াশোনার শেষ পর্ব নির্বিঘ্নে চলতে থাকে। সে দিব্যি দায়হীন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে বড় হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক খুব সম্ভব ভাইকে দাঁড়াতে সাহায্য করা আর কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও পরিত্রাণ দেখতে পায়নি। সে-ই উদ্যোগ করে ভাইয়ের বিয়েটা দেয়। ভেতরে ভেতরে শশাঙ্ক যন্ত্রণা বয়ে বেড়ায়। বাবা-মার মর্মান্তিক মৃত্যু তাকে বিশ্রাম নিতে দেয় না। কথাগুলো বলে না ব'লেই ভেতরে আরও গুমট— এগুলো কঙ্কণা বুঝতে পারে। দাদাকে সেবা-যত্নই তো করতে চায় সে। একটা সীমা পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু নিত্য দিন ভাইয়ের স্ত্রীর ওপর নির্ভরতা শশাঙ্ক পছন্দ করে না। সেভাবে দেখতে গেলে তাই বিয়ের পর কঙ্কণার কোনও শৃঙ্গজয়ই হয়ে ওঠেনি। এমনকী, হাতের কাছের ভাসুর পর্যন্ত না। স্বামীকেই বা পারল কই! সে কেমন নিজের তালে আছে। কীসে আরও প্রোমোশন, কীসে আরও কতক চাট্টি টাকা আসে! আরে অত প্রোমোশন টাকা দিয়ে করবি কী! গৃহসুখ বলতে কিছু যদি না-ই পাস? এবং গৃহস্থের খোকা-খুকু কিছু হল না।

কঙ্কণা এখন তার সেলাই-শিক্ষা কাজে লাগিয়ে চুপচাপ কিছু অর্ডার নিচ্ছে। এ যদি কোনও লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা হয় তো তা-ই। কিন্তু চার পাশটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা। স্বভাবে সে চটপটে, হাসিখুশি। মুখভার করে থাকা তার পোষায় না। তাই শূন্যতাটার কথা তার জামসেদপুরের আপনজনেরাও কেউ জানে না।

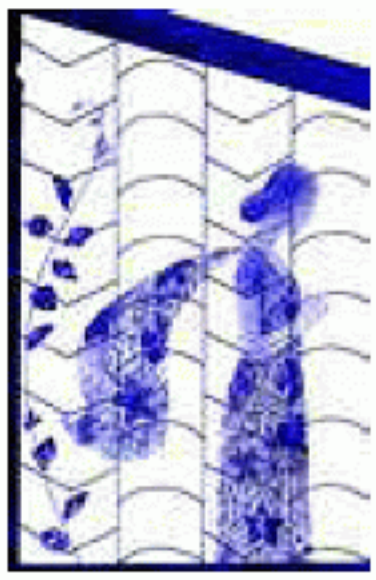

কোল-বারান্দা সামনের দিকে। ঘাপটি মেরে বসে সে দ্যাখে যাওয়া-আসা। আলগা একটা চোখ ফেলে রাখে শুধু। ভেতরে জাল বুনে যায়, অভ্যস্ত চিন্তার জাল। মন চিন্তা ছাড়া থাকতে পারে না কিনা। মৃগাঙ্কর মন বড় অদ্ভুত! কী রকম স্পটলাইটের মতো। যেটুকুতে পড়ল সেটুকুকেই আলোকিত করল। সেই ছোট্ট বিন্দুটার বাইরে অতল অন্ধকার। সিগারেট খাচ্ছে। কিচ্ছু জিজ্ঞেস

করো, বলবে— দেখছ একটা কাজ করছি। ধূমপান করাটা আবার কাজ? কঙ্কণা হয়তো হেসে উঠল। মৃগাঙ্ক বলবে— এর ভেতরে অনেক কথা আছে, ম্যাডাম। স্মোক করছি, ধোঁয়াটা গিলছি না। সিগারেটটা অর্ধেক বাইরে জ্বলছে, অর্ধেক মুখে। এতে কনসেনট্রেশন লাগে, তুমি তুশ্চু স্ত্রীলোক, তুমি কী বুঝবে। খেতে বসে গল্প হবে এঁটো হাতে, তবে না খাবার তৃপ্তি। তখন যদি সে অতীতের সেই ভয়ংকর দিনগুলোর কথা তোলে, সে বলবে— তুমি তো তখন ছিলেই না। এ সব নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কথাই নয়।

মুখে মুখে জবাব দেবার মতো উপস্থিত বুদ্ধি কঙ্কণার জোগায় না সব সময়ে। পরে জবাবটা ধরা দেয়। যে মুহূর্তে এদের বাড়ির বউ হয়ে ঢুকেছে, এ পরিবারের ইতিহাসে তারও তো উত্তর াধিকার জন্মে গেছে! তার অধিকারেই সে অতীতের কথা তোলে। স্মৃতির মধ্যে ঢোকা মানেই পরিবারের গভীরে ঢোকা। নইলে তো তুমি বাইরের লোক রয়ে গেলে। নেহাত হাউজকিপার, শয্যাসঙ্গিনী। কোনও নারী, কোনও মানুষ এ ভাবে থাকতে পারে না কি? মৃগাঙ্ক এ সব সরু সরু কথা বুঝতে পারে না। সে মোটা মোটা খড়ির দাগের মানুষ।

'প্রেস' লেখা গাড়িটা ঢুকল। শশাঙ্ক তার দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তার চলা-ফেরায় একটা সতর্কতা। চটপটে ভাব আছে ঠিকই, কিন্তু পুরো চেহারাটার ওপর ভীষণ একটা অন্যমনস্কতার ছাপ। সব সময়েই যেন কী ভাবছে। মনটা যেন এখানে নেই, অন্য কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশ কিছু দিন ধরে এটা বেড়েছে। ঠিক কী ভাবে সে, কোথায় মনটা রেখে আসে, তারও কি কোনও স্পটলাইট আছে? খুব জানতে ইচ্ছে করে কঙ্কণার। সত্যিই তো, এখনও পর্যন্ত সে কোনও মানুষের মন জানল না, তার মনও কেউ জানতে চায়নি। এখন সন্ধে সাড়ে সাত।

তার বাড়ির বেলটা কি বাজল? কঙ্কণা বারান্দা থেকে দরজায় পৌঁছতে বেশি সময় নিল না। সে খুব ঝরঝরে চটপটে মানুষ। স্কিপিং করা মেয়ে বাবা! কী আশ্চর্য! বাইরে তো শশাঙ্কই দাঁড়িয়ে! একটু অপ্রস্তুত ভাবে মাথায় হাতটা বুলিয়ে নিল শশাঙ্ক। দু'একটা লম্বা পাকাচুল বিপর্যস্ত হয়ে এ দিক ও দিক ছড়িয়ে পড়ল। বলল— হঠাৎ প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেল বুঝলে? কিছু আছে-টাছে? না থাকলে কষ্ট করতে হবে না।
—আছে আছে। কঙ্কণা তাড়াতাড়ি বলল, আপনি গিয়ে চান করুন, আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

মেয়েদের স্বভাব তারা শুধু নিজেদের জন্য কিছু করার উৎসাহ পায় না। কঙ্কণা তার ব্যতিক্র ম হতে পারল কই? তার সত্যি বলতে কি কিছুই ছিল না। এখন চটপট প্রেশারে একটা হালকা খিচুড়ি করে নিল। তাতে তরিতরকারি যা ছিল বেছেকুছে দিল। মাছ ভাজল। চাটনি ছিল। ঠিক কুড়ি মিনিটের মাথায় শশাঙ্কর ফ্ল্যাটে পৌঁছল সে। মাথা থেকে মানুষটির পটপট করে জল পড়ছে। কোনও ক্রমে পায়জামার ওপর একটা গোলাপি মতন পাতলা পাঞ্জাবি চাপিয়েছে। জায়গায় জায়গায় ভিজে উঠেছে সেটা। শশাঙ্ক দরজা ছেড়ে দাঁড়াল।
কঙ্কণা ছোট খাবার-টেবিলটার ওপর তার ক্যাসেরোল রাখল। সঙ্গে আজ ঝুলিতে করে প্লেট-টেট নিয়ে এসেছে সে। প্লেট গ্লাস জলের বোতল। শশাঙ্কর ডেরার মুরোদ জানে সে।
হঠাৎ শশাঙ্ক বলল— একটু বসবে? তোমার সঙ্গে একটু কথা, একটু পরামর্শ ছিল।

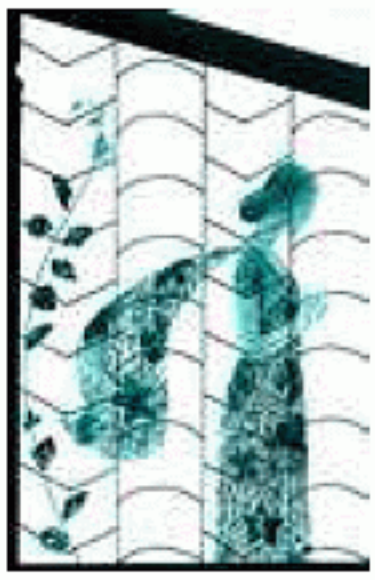

কঙ্কণা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে? কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে? পরামর্শ?

শশাঙ্ক দ্য গ্রেট। মৃগাঙ্ক দ্য গ্রেট-এর বড় ভাই, যিনি সাবধানে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর ভাই-বউয়ের সাহচর্য সাহায্য থেকে বাঁচিয়ে চলেন, বস্তুত লোটনের কথা ছাড়া আর কোনও কথাই জিজ্ঞেস করেন না, সেই তিনি ভাই-বউ দ্য লিট্‌ল, কঙ্কণা দ্য লিট্‌ল-এর কাছে কী পরামর্শ চাইছেন! প্রেমে-ট্রেমে পড়েছেন না কি? কিন্তু এদের কাছে তার কোনও আবেগের প্রত্যাশা নেই। তাই সে সংযত থাকে। বলে— বলুন। বসছি। খিদে পেয়েছিল বলছিলেন যে? যেন সে পরামর্শের অন্তরঙ্গতাটা স্থগিত করে দিতে চাইছে।

—হ্যাঁ তাই। আসলে সারা দিন যে একেবারেই খাইনি। খালি চা, চা আর চা, মনে ছিল না। হঠাৎ বাড়িতে ঢোকবার সময়ে টের পেলুম খিদেটা। ক'দিন সমানে জাঙ্ক ফুড! ওই সব সাব ওয়ে-টোয়ে হয়েছে না? কেমন বিশ্রী লাগল হঠাৎ, তোমার কোনও অসুবিধে-টিধে...
কঙ্কণা কিছুই বোঝায় না এমন একটা হাসি দিল। তার অসুবিধের কথা ইনি বড্ড বেশি ভাবেন। কাঁটা হয়ে থাকেন একেবারে। সুবিধের কথাটা ভাবলে পারতেন বরং। ইনি যে তাকে একটা বিয়েই দিয়েছেন, গেরস্থালি বলতে কিছু দ্যাননি, সেটা কি ইনি বোঝেন? এঁদের, বিশেষ করে এঁর ভাইয়ের যে মলাট ছাড়া আর কিছু নেই— স্বাস্থ্যবান, বলতে কইতে ওস্তাদ, ভাল অঙ্কের মাস মাইনে, ব্যস ভেতরে ফক্কা। ইনি জানেন সেটা?
খাবার মুখে তুলল শশাঙ্ক।— বেশ। তার সারা মুখে একটা খুশি ছড়িয়ে পড়ল। এত দিন এত খাইয়েছে, কখনও এমন দেখেনি কঙ্কণা। হঠাৎ গোঁত্তা খেয়ে খুশিটা যেন থেমে গেল।
—ধরো একটা বাচ্চা ছেলে আড়াই-টাড়াই হবে, একটা ট্রমার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে... হ্যান্ডল করতে পারবে?
—মানে? কঙ্কণা সোজা হয়ে বসল।— ল্যাজা নেই মুড়ো নেই, কী বলছেন ভাল করে বলুন!

শশাঙ্ক নিঃশব্দে খেতে থাকে। সে তো জানতই তাকে বিশদ হতে হবে। কেমন করে, সেটাই কথা। খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। ও দিকে লোটনও নেই।
খাওয়া শেষ করে মুখ হাত ধুয়ে এল সে। হঠাৎ যেন মেয়েটির সামনে তার বে-আব্রু দশা। সে অসহায়, পরামর্শ চাইছে। সাহায্য চাইছে। নিজের চাকরি সূত্রে উৎপন্ন কিছু সমস্যার কথা বলতে হচ্ছে। তার ঢাকনা-পরানো স্বভাবে এমনটাই মনে হল।
কঙ্কণা থালা-টালা গুছিয়ে নিচ্ছে।
সে অগত্যা বলল— কই, কিছু বললে না?
—আপনিই বা কী বললেন? বাচ্চা হ্যান্ডল করতে পারব কি না? হ্যাঁ পারব। কিন্তু ব্যাপারটা তো আমাকে জানতে হবে!

জল বড্ড দূর গড়িয়েছে। মাস দেড় হল বাচ্চাটা হাসপাতালে। এখন তার ফেরবার সময়। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু বাড়িতে বৃদ্ধ দাদু ছাড়া কেউ নেই। তার মাতৃ-পিতৃহীনতার কথাও তো শিশুটি জানে না। ভয় খায়, হঠাৎ হঠাৎ পোকা-পোকা বলে তুমুল কঁকিয়ে ওঠে।

শশাঙ্কর অবশ্য এ সব ভাবার কথা নয়। কিন্তু নিজের উদ্ধার করা শিশুটিকে সে প্রতি দিন দেখতে যেত। তাকে খুব চিনেছে। সে না গেলেই কান্নাকাটি করবে। তার দাদু কার্তিক সামন্ত এই ক'দিনে খুব ভেঙে-চুরে গেছেন। স্বাভাবিক। জোর তদন্তও চলছে। এক দিনই মাত্র তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে নাতিকে দেখতে এসেছিলেন। তারই মধ্যে কোনও ক্রমে শশাঙ্কর হাতে একটি চিরকুট গুঁজে দিয়ে যান। তাতে লেখা— চিনু ইন ডেঞ্জার। বাড়িতে নিয়ে গেলে ও এ বার খুন হয়ে যাবে। আপনি দয়া করে আমার নাতিকে বাঁচান। আমি পুলিশকেও বিশ্বাস করি না। সবাই টাকা খেয়ে গেছে।

প্রেসের তরফ থেকে আরও সংবাদ, পরবর্তী সংবাদের অছিলায় দু-তিন বার সে কার্তিক সামন্তর সঙ্গে দেখা করেছে। তা না না না করে তিনি যেটুকু বলতে পেরেছেন তা বড় ভয়ানক।

তাঁর সম্পত্তি অনেক। একটি ছেলে একটি নাতি। ছোট ভাইয়ের পরিবার বেশ বড়। তারা তাঁর টা নানা ভাবে দখল করতে চেষ্টা করছে। ছেলে তারক খুব শক্ত ছেলে ছিল। সুবিধে হচ্ছিল না। মোটের ওপর তাঁর ধারণা এই খুনের পেছনে কোনও মস্তান নয়, তাঁর নিকট আত্মীয়রাই র য়েছে। কাউকে সুপারি-টুপারি দিয়ে করিয়েছে। চিনচিন নিকেশ হয়ে গেলে তারা কার্তিক সা মন্তর সম্পত্তিটা পুরো পায়।

প্রাণঘাতী ভয়ে দাদু নিরুদ্দেশ করে দিতে চাইছেন নাতিকে। তাতে সাহায্য লাগবে শশাঙ্কর। এই মুহূর্তে সন্দেহের কথা বলাও বিপদ। কারণ ওই, পাড়া-মস্তান পুলিশ সবাই নানা ভাবে টাকা খেয়ে আছে। আশ্চর্য! শিশুটির জন্য তার কাকা-কাকিদের উদ্বেগ ও ভালবাসায় কোনও ঘাটতি তার চোখে পড়েনি। এত দিনের অভিজ্ঞতায় সে রাজনীতির লোকেদের হিপক্রিট বলে চিনেছিল। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, যারা খেয়ে পরে সুস্থ হয়ে চমৎকার বেঁচে থাকার সুযোগ পাচ্ছে, তারা ডবল পাওয়ার জন্য দু'জন নিকট আত্মীয়কে এবং বাড়ির একমাত্র সুন্দর একটি শিশুকেও খুন করতে পিছপা হচ্ছে না, এবং তারা এমন করে নিত্যকর্ম করে যাচ্ছে যে ব্যাপারটা টের পাওয়া শক্ত? শশাঙ্ক ব্যাপারটা তার সহকর্মীকে জানায়। সে বলে— এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? দিবারাত্র এ সব ঘটনা ঘটছে এখন। মানুষ আর মানুষ নেই। পিশাচ হয়ে গেছে। তার কথার ধরন শুনে শশাঙ্কর মনে হল মানুষের মানুষত্ব বা পিশাচের পিশাচত্ব কোনওটাই সঠিক উপলব্ধি করে সে কথাগুলো বলল না। যে কোনও ঘটনাকে তার খবর-মূল্য অনুযায়ী দেখতে দেখতে সাংবাদিকদের এই অবস্থাই হয়।

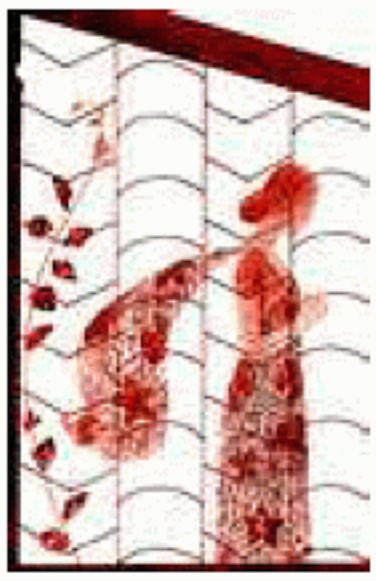

সমস্ত শুনে কঙ্কণা স্তব্ধ হয়ে থাকে— এমনও হয়!
আমাকে এক বার নিয়ে যাবেন বাচ্চাটার কাছে?
—ও রিস্‌ক নিতে পারব না। তোমার সঙ্গে বাচ্চাটাকে কেউ যেন কানেক্ট করতে না পারে। আমি শুধু চুপচাপ ওকে তোমার কাছে এনে দিতে পারি। তার পর কী?
—আমি ওকে নিয়ে জামসেদপুরে চলে যেতে পারি। চট করে খোঁজ পাওয়া যাবে না। কিন্তু আপনার ভাইকে সামলাতে হবে। তার ওপর ধরা পড়লে আমাকে তো লোকে ছেলেচোর বলবে! ভেবে দেখুন।
—তা বলবে না। কার্তিক সামন্তর কাছ থেকে আমি লিখিয়ে নেব সব।

কী ভাবে দাদু হাসপাতাল থেকে আচমকা ফোন পেয়ে নাতিকে একলা রিলিজ করতে চলে এলেন। কী ভাবে দাদু রাস্তায় বেরলে একটি ঝাঁকড়াচুলো জোয়ান মতো লোক তাকে তাঁর কোল থেকে হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়, বৃদ্ধ রাস্তায় বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকেন। সে এক শ্বাসরোধকারী গল্প। কিন্তু শক্ত হাতে বোনা। তাতে না পুলিশ, না নিকটাত্মীয় কেউ কোনও খুঁত বার করতে পারে না। এবং সাঁঝের অন্ধকারে একটি সাধারণ দর্শন মারুতি ওয়াগন স্টিলসিটির দিকে রওনা হয়ে যায়। শিশুটি সামান্য ঠোঁট ফুলিয়েছিল। কিন্তু অচিরেই আদরে, খেলায় ভুলে যায়। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

"বেহালায় দম্পতি খুন ও শিশু অপহরণের ঘটনায় নতুন চমক, নতুন মোড়" বলে যে প্রতিবেদনটি পর দিনই বেরোয়, তার জন্য খাটতে শশাঙ্ক ৫/১ বাড়ি আর অফিস, অফিস আর

৫/১ বাড়ি করতে করতে ক'দিন নাইবার খাবার সময় পেল না।

একটাই খুঁত গল্পটাতে। কঙ্কণা তার অনুরোধে দুর্ঘটনায় মৃত দম্পতির অনাথ একটি শিশুর ভার নিয়েছে, এ কথা শশাঙ্ক তার ছোট ভাইকে জানিয়েছে। লোটন ক্ষুব্ধ। কিন্তু যেহেতু দাদা মনে করিয়ে দিয়েছে, সে এত দিন লোটনের গায়ে কোনও ঝড়-ঝাপটা লাগতে দেয়নি, আজ মানবিক সংকটে পড়ে দাদা যদি তার একটা সাহায্যই চায়, লোটন কি আপত্তি করতে পারে? করা সঙ্গত?

না, পারেনি। কিন্তু সে ক্ষুব্ধ। আসুক, তাকে বোঝাতে হবে। তারই তো ভাই। পাখনার তলায় রেখে বড় করেছে অথচ কী এমন তফাত বয়সের! বুঝবে। যুক্তির ভাষা নিশ্চয়ই বুঝবে।

নূহর নৌকা

বাণী বসু

কলকব্জার যুক্তিতর্ক

মানুষের জীবনে অনেক অ মানুষেরও অংশ থাকে। যেমন, গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার, পাখি, পোকা, ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস। এগুলো প্রত্যক্ষ। সম্পর্ক নির্ণয় করা সহজ। গাছপালা ছায়া দেয়, ভূমি সংরক্ষণ করে, ফল ফুল শস্য দেয়। প্রধান প্রধান খাদ্যবস্তু উদ্ভিদ থেকেই মেলে। গৃহপালিত জন্তু থেকে দুধ মাংস পরিবহণ পাওয়া যায়। বনের জন্তু-জানোয়ার মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে এক খাদ্য পিরামিড তৈরি করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করছে। পাখি পোকাপুকি খেয়ে দেয়ে সাফ করে সব, জমাদার পাখিরা জঞ্জালও খায়, কেউ কেউ মাংস এবং ডিম দেয় আমাদের আহারের জন্যে। ব্যাকটিরিয়া ভাল আছে, মন্দ আছে। ভাইরাসও তাই। আসলে, মানুষের ভাল-মন্দ সূত্রে তাদের কথা আমরা ভাবি, পড়ি। কিন্তু মানুষের জন্যেই তারা সৃষ্টি হয়েছে এ কথা বোধহয় সত্যি না। সে যাই হোক। কিন্তু যন্ত্রপাতি? তারাও তো আমাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ? আমরাই তৈরি করেছি, ধাতু ব্যবহার করে।

একটা তালা ধরুন। কী চমৎকার তার কেজো চেহারাটা। গোল হাতল, চৌকো কিম্বা গোল বডি, ভেতরে একটি কল আছে। হাতলের সঙ্গে খাপে খাপে বসে যায়। হয় এমনি লক হয়ে গেল। তা নয়তো চাবি দেওয়া হবে। বহু দিন আগে উদ্ভাবিত হয়েছে, কিন্তু ছোট্ট হলে কী হবে সামান্য নয়। আজ তার ব্যবহার এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে, তালা তৈরি করেই এক জন কোটিপতি হতে পারে। যে দিকে চাও তালা ঝুলছে। এ বাড়িতে কেউ থাকে না— তালা। এ বাড়ির লোক বেড়াতে গেছে ডবল তালা। স্যুটকেশ, ট্রাঙ্ক, আলমারি, সিন্দুক, কোল্যাপসিব্‌ল গেট। সর্বত্র তালা ঝুলছে। অফিস টাইম শেষ হল। চলল দারোয়ান ঘরে ঘরে তালা মারতে মারতে। দোকান বাজার অফিস বসতবাড়ি বাক্স দরজা লিফট, সব জায়গায় তালা তালা তালা। ছোটখাটোগুলো আবার হারায়, খুব। আবার কেনো-ও সুতরাং।

ঠিক এমনি মোটর বাইকও একটা যন্ত্র। তার পার্টস আসতে পারে নানান খুচরো কারখানা থেকে। তার পর খুটখাট সব ফিট করে ধাপে ধাপে গড়ে উঠতে থাকে মোটরবাইক। রং হয়। চকচকে ঝকঝকে। তার পর সব আসে ঝিঙ-চ্যাক্ শো-রুমে। একটু হেলিয়ে ২৫০ ডিগ্রি মতো কোণ করে তাকে তাদের সাজিয়ে রাখা হয়। সেজেগুজে পোজ নিয়ে যেন একদল যূথবদ্ধ নর্তক। চমৎকার কোরিওগ্রাফি রেডি। শিগ্‌গিরই শুরু হবে তালে তালে নাচ। এইটুকু আমরা সবাই জানি। টেকনিক্যাল ডিটেল, খুঁটিনাটি জানবার মতো যন্ত্রোৎসুক আমরা নই। কিন্তু মোটরবাইক জানে। তাকে জানতে হয়। তার টায়ার, তার টিউব, সিট, পিলিয়ন, ব্রেক, স্টার্ট প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশকে চালু রাখতে শুধু ডিজেল নয়, তাতে সামগ্রিক ইচ্ছাশক্তি লাগে। ছোট ছোট নাট, বল্টু, স্ক্রু, স্প্রিং, ফোম, ইস্পাত, প্লাস্টিক, চামড়া সমস্ত অজৈব বস্তুর মিলিত এক অন্ধ ইচ্ছাশক্তি। বস্তুপুঞ্জের একটা ভারও তো আছে। আর ভেঙে ভেঙে ফেললে তো সেই একই অ্যাটম কণা, যা পাখির, জন্তুর, গাছপালার, মানুষের শরীরেরও আদি বস্তু। তা হলে কী করে বলি তার ইচ্ছাশক্তি নেই! দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না এই পর্যন্ত।

এবং কারখানা। সে-ও তো এক গৃহ। সেখানে বাস করে কল-কব্জা, বড় বড় মেশিন। সারা দিনের কাজের পর মানুষ ফিরে গেলে তালা পড়ে গেটে। তখন কারখানার ভেতর দিকে তাকালে দেখা যাবে অন্ধকারে ভুতুড়ে সব আকার। মেশিনপত্তর সব যে যার জায়গায় স্থাণু। কিন্তু যেন কিছু চালাচালি করছে তারা। কথা নয়, তাদের নিজের জগতের কোনও ধরনের কমিউনিকেশন। কত কারখানা পড়ে আছে বড় ছোট। সেগুলো পোড়ো। যন্ত্রে জং ধরছে। নাম কাওয়াস্তে এক দারোয়ান আছে। সে নিজের দারোয়ানগিরিটাকে খুব গুরুত্ব দেয় না। দেশোয়ালিদের সঙ্গে ফুর্তি করতে যায়।

ছোট কারখানা। কারও একক প্রচেষ্টায় হয়তো গড়ে উঠেছিল। ক্রমবর্ধমান মার্কেটের বিলিয়ন ডলারের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি-বাণিজ্য-বিপণন চক্রের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তার কম্মো নয়। ভাল কন্ডিশন-এর যন্ত্রপাতি সে বেচে দিয়েছে। পুরনো মডেলের মাল কিছু রয়ে গেছে। আছে শেডটা। আর জমি। এইটুকু বেচে দিতে পারলে উদ্যোগপতি নিজেকে ধন্য মনে করবে। কী কুক্ষণেই বেচারা ক্ষীয়মাণ চাকরির দুনিয়ায় সেল্‌ফ-এমপ্লয়মেন্টের হুজুগে কান দিয়েছিল। কুড়ি-পঁচিশ বছরের শ্রম, মগজ খাটানো। তিল তিল করে জমানো পয়সা, ব্যাঙ্ক লোন। তার সুদ কষা, টেনশন, সব শেষে উদ্যোগপতি এখন ফ্রি মার্কেটের, বিশ্বায়নের বলি। ঘরে বসে আছে। রক্ষা এই যে, খুব বেশি লেবর ছিল না। এক এক করে বিদায় দিতে পেরেছে। লোকসান স্বীকার করে কোনও মতে বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে। কার চাকর হবে এখন, উদ্যোগী ভাবছে মনে মনে। ডিগ্রির চেয়ে কারিগরি বুদ্ধি ছিল বেশি। তাই।

ইতিমধ্যে বন্ধ কারখানাই কি ভাবছে না? কী প্রয়োজন ছিল এ সবের, যদি এই ব্যর্থতাই কপালে লেখা ছিল! কারখানা মনে করতে পারে, এক পয়লা বৈশাখ তার মহরতের কথা। কলাগাছ, নতুন কলসিতে আম্রপল্লব, আর ডাব। গণেশ পুজো। লুচি-মন্ডার প্রসাদ। পার্টস আসত নানান জায়গা থেকে। সে সব অ্যাসেম্বল করে ওয়াশিং মেশিন। তখন জিনিসটার এত রমরমা ছিল না। ধনী লোকের বাড়িতে, বড় বড় হোটেলে, হাসপাতাল-নার্সিংহোমে সাপ্লাই যেত 'পালসার'। আজও সেগুলো বিনা আয়াসে চলছে। বড় বড় ব্র্যান্ড যেই বাজারে এসে গেল, তারা চতুর্দিক ছেয়ে দিল বিজ্ঞাপনে। বড় বড় শো-রুমে ক্রেডিটে পাঠিয়ে দিল মাল। চতুর্দিক তাদের মহার্ঘ প্রতিশ্রুতিতে ভরে গেল। পালসার তার শপথ ভাঙেনি। কিন্তু তার বিজ্ঞাপন কই? হোর্ডিং? নামী দোকানে তার ঝাঁ-চকচকে শো! ব্র্যান্ড নেম কই? একটা পণ্যের পেছনে একটা বড় বিজনেস হাউজের নিরাপদ উপস্থিতির নাম ব্র্যান্ড নেম। পালসার-এর কি তা ছিল? তা হলে কেন সেল্‌ফ এমপ্লয়মেন্টের ঢাকটি বাজালে?— শূন্য কারখানার বাঁ দিকের ফাঁকা বাতাস প্রশ্ন করে ডান দিকের ফাঁকা বাতাসকে। ফিস ফিস করে কে বলে— ইকন্‌মিক্‌স— ম্যাক্রো, মাইক্রো, চক্কর-বক্কর, জি ডি পি, ম্যালথাস, কেইনস, গ্রামীণ, শহরীণ ঝক্কড়-মক্কড় গ্যাট ম্যাট ক্যাট।

ইংরেজি নববর্ষের আগের দিন। খবরের কাগজের আপিসে বাসর জাগিয়ে বসে আছে কম্পিউটার আর ফ্যাক্স যন্ত্র, টেবিলে টেবিলে দিন কি রাত বোঝা যায় না এমন আলোয় নির্ঘু

ম সাংবাদিক নিউজ ডেস্কে।

শশাঙ্ক আজ পেয়েছে অতুল বণিক ফটোগ্রাফারকে। শশাঙ্ক-অতুলের যুগলবন্দির সুনাম আছে। পার্ক স্ট্রিট কভার করে কানেক্টর দিয়ে ছুটছে প্রেসের গাড়ি। সামনে প্রচুর গাড়ি বাইকের গাঁদি। অতুল টুকটাক ছবি তুলে নিচ্ছে। নতুন গজিয়ে ওঠা হোটেলগুলো আপাদমস্তক আলোকসজ্জায় সেজেছে। বাইরে গাছপালা ঝোপঝাড় সব কিছুতে আলো। আলোর তাল গাছ। আলোর ঝাউ।

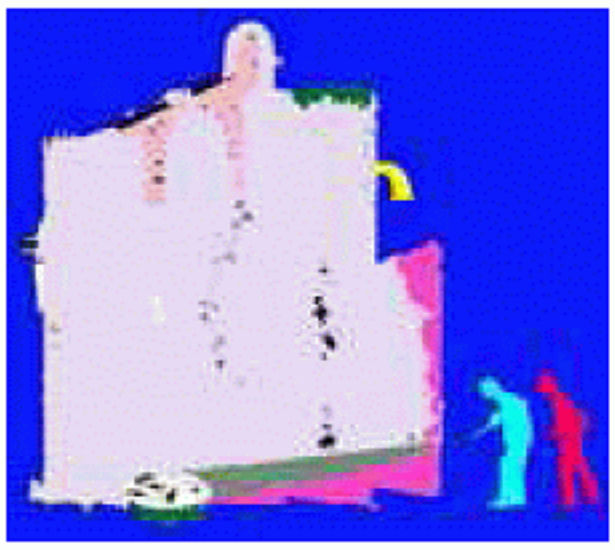

—যে কোনও উৎসবই এখন বিজ্ঞাপন হয়ে যাচ্ছে, খেয়াল করেছিস, শশাঙ্ক?
—হুঁ।
—ক'বছর ধরে বিজ্ঞাপনের হাত পাকড়ে উঠে আসছে পয়লা বৈশাখ। আচ্ছা বলতো, পয়লা বৈশাখে হালখাতা ছাড়া আর কী কী ছিল!
—আমার তো কিছুই ছিল না।
—সে তুই মফস্‌সলি বলে। কয়লা-টাউনে ছোটবেলা কাটিয়েছিস। আমরা পয়লা বৈশাখ দেখেছি কিছু কিছু। ধর, ছুটি তো নিশ্চয়ই। আরে এই গরমের দেশে মানুষ কাঁহাতক গা ঘা মাবে? বাবার হাত ধরে দোকানে দোকানে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যেতুম। মিষ্টির বাক্‌সো, কিংবা মাটির প্লেটে করে গুচ্ছের মিষ্টি। ছোটবেলায় দারুণ লাগত কিন্তু। নতুন কাপড় হত, বিশেষ বাড়ির মেয়েদের। তখন তো সারা বছর ধরে এমন লাগাতার মার্কেটিং ছিল না। বাল্ক কেনাকাটা পুজো আর পয়লা বৈশাখ। দুটোতেই ডাহা সেল। বচ্ছরকার জিনিস কেনো। এখন সব পুঁচকে পুঁচকে ছেলেমেয়ের ওয়ার্ডরোব নিয়ে কভার স্টোরি করতে হচ্ছে। হেসে আর বাঁচি না।
শশাঙ্ক বলল—হুঁ।
—আচ্ছা এরা কি বাংলার নববর্ষটাকে বাংলার, বাঙালির প্রতি বিগলিত প্রেমে রিভাইভ করতে চাইছে?
—না।
—আরে ঝেড়ে কাশো না বাবা। কী তখন থেকে সুন্দরবাবুর মতো হুম হাম করছ।
—কে সুন্দরবাবু?
—সে তুমি চিনবে না। একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর। আমার কথাটার জবাব দে।
—জবাব তো তুমিই একটু আগে বলে দিলে। বিক্রি, আরও বিক্রির যে কোনও সুযোগ এরা প্রোমোট করবে।
—ধর মে-ডে'র সেলিব্রেশন লাল পতাকা, লাল কার্ড, লাল মিষ্টি, লালমোহনবাবু, লাল দই...কিংবা ধর, বিশ্বকাপ পরাজয়ের পোস্টার, স্ট্যাচু মানে পুতুল-টুতুল। সচিন 'থিংকার'-এর পোজে, রাহুল ক্রুসে ঝুলছে। সৌরভ অ্যাপলোর মতো মাসকুল ফুলিয়ে এইসা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
শশাঙ্ক বলল— সুনামি নিয়েও করতে পারে। সুনামি-ডে। আসুন অ্যাকোয়া ওয়র্ল্ড, এসেল ওয়ার্ল্ড, সুনামি উপভোগ করুন, টোয়েন্টি মিটার ঢেউ, ঝড়ের গতি টু হানড্রেড কিলোমিটার্স পার আওয়ার। বিধ্বস্ত হয়ে যান। তার পর তার পর ফিউশন ডিনার। কেন বলো তো? সুনামির পর তো তোমাকে যা পাচ্ছ সাপ-ব্যাঙ তাই-ই খেতে হবে। সুনামি রেসিপির কম্পিটিশন হায়াত কী তাজ বেঙ্গলে।
—ব্রেনগুলো গুরু পেল কোত্থেকে বল তো!
—সব কিছুরই কোর্স হয়েছে আজকাল অতুলদা। ভর্তি হয়ে যাও।

—সামনে একটা গোলমাল পাকাচ্ছে মনে হচ্ছে?— অতুল বণিক মন্তব্য করল।
একটা ব্লু সিয়েলো মেন রাস্তা থেকে বাঁ দিকে নেমে যাচ্ছে। পেছনে কতকগুলো মোটরবাইকও।

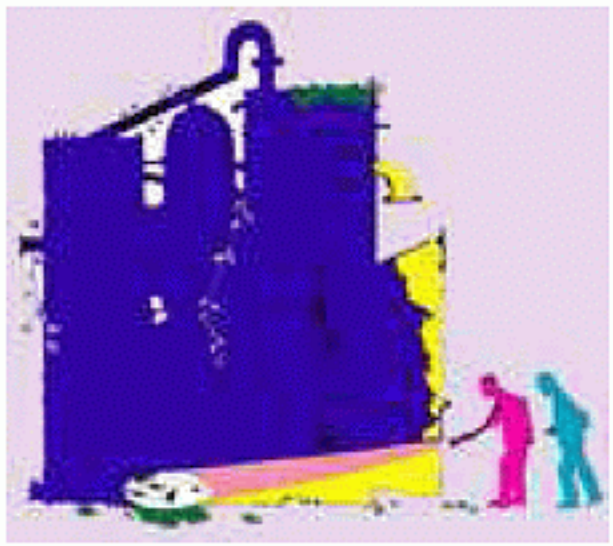

—রাস্তা ছোড়ো ইয়ার— আপন মনেই বলল অতুল। তার খুব ফুর্তি আজ।
একটি বিখ্যাত ফাইভ-স্টার হোটেলের নিউ-ইয়ার ধামাকার খুঁটিনাটি কভার করে মনের সাধে পাইন-অ্যাপল অ্যান্ড পিসতাশিও চিকেন, পায়েস ক্যারামেল, বেকড ফ্রুটস বেগমবাহার, ে মাগলাই ক্যাসর্টো ইত্যাদির ছবি-টবি তুলে সেই জায়গাটাতে দু'জনে যখন ফিরল তখনও সিয়েলো গাড়িটা দাঁড়িয়ে, গলির মোড়ে কেমন সন্দেহজনক ভাবে বেঁকে। কাছে গিয়ে দেখল পরিত্যক্ত। দরজা হাতল ঘোরাতেই খুলে গেল। নামো অতুলদা— শশাঙ্কর গলায় যেন আদেশের সুর।
—আরে ছোড় না ইয়ার। সিয়েলোকো কোই ছোড় সাকতা নহি ক্যা?

কিন্তু শশাঙ্কর সেই বিখ্যাত নাক, তাকে দিয়ে প্রেসের গাড়ি থামায়। অতুলকে নামতে বাধ্য করে। খোলা গাড়ির ড্যাশবোর্ডে কোনও চাবি নেই এবং সামনের সিট দুটোয় চটচটে গাঢ় রঙের কী একটা পদার্থ, টর্চের আলো পড়তেই বোঝা গেল রক্তই। অতুল বণিক বলল— ইউ উইন ম্যান। চলো এক্সপ্লোর করা যাক।

শশাঙ্ক প্রথমেই তার সেলফোনে লালবাজারে খবর দিল। তার পর গাড়িটা গলির মুখে আড়াআড়ি থামিয়ে ঢুকল। এবং তখনই মাটি কাঁপছে বুঝতে পারল। না বোমাটোমা নয়। মাটি তাকে দ্রুত বুঝিয়ে দিল গরগর করতে করতে কিছু মোটরবাইক আসছে। অচিরেই খ্যাপা ে মাষের মতো ছুটে এল তিনখানা। চার সওয়ারি নিয়ে। উল্টো দিক থেকে এমন জোরে যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌঁছবার তাড়া তাদের। শশাঙ্ক তার হাতের শক্তিশালী টর্চটা তাক করল সোজা সামনের বাইক সওয়ারির চোখে। গোঁত্তা খেয়ে উল্টে গেল গাড়িটা। পেছনের দুটোও স্পিডে আসছিল, প্রায় এ ওর ঘাড়ে পড়তে গিয়ে সামলে নিল। বাইকরা সমস্বরে বলল— ডিগবাজি খেলাম মালিক, খেতে হল, মনে কিছু কোরো না।

অকথ্য গালাগাল ভেসে এল ও দিক থেকে— শুয়োরের বাচ্চা, সান অব আ বিচ এবং চলতি চার অক্ষর। এই সময়ে অদূরে গাড়ির 'প্রেস' লেখাটার ওপর অতুল বণিকের টর্চের আলো পড়ল। দু'জন দুদ্দাড় করে এ দিক ও দিক পালিয়ে গেল। মোটর বাইক নিয়েই, আশপাশের এবড়ো খেবড়ো ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে। গোঁত্তা খাওয়া বাইকটা ফেলে রেখে প্রথম জন পায়দল ভাগতে থাকল। বাইক গোঁ গোঁ করে বলল— আমি প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র। আমার কাজ আমি করেছি। এ বার তোমরা বুঝে নাও। ড্রাইভারের হাতে বাইকটা জিম্মা রেখে দু'জনে এগোচ্ছে।

অতুল বলল— গাড়ি ছিল, লোকটাকে চেজ করা উচিত ছিল কিন্তু।
—বাইকটা তো আছে। পুলিশ বুঝবে।— শশাঙ্ক আর সময় নষ্ট করতে চায় না। কেন সিয়েলো গাড়ি পরিত্যক্ত খোলা পড়ে থাকে। মোটরবাইক আরোহী চার জন এ দিকে কোথায় গিয়েছিল, কেনই বা খ্যাপা মোষের মতো ছুটে আসছিল, পালালই বা কেন? তাকে জানতে হবে। সে কিছু একটা টের পাচ্ছে।
সামনে একটা কারখানা। মস্ত গেট বন্ধ, কোথাও কেউ নেই। অতুল বলল— হল তো?

শশাঙ্ক এগিয়ে গিয়ে দরজার তালাটা ধরতেই সেটা শব্দ করে পড়ে গেল। কল বই তো নই। যা করেছি খুব করেছি— তালাটা খুব নিচু ডেসিবেলে বলল। শশাঙ্কর রগের শিরা প্রচণ্ড লাফাচ্ছে। সে ঠ্যালা দিতেই কারখানার পুরনো দরজা কব্জাগুলোর ওপর দুলতে লাগল। যেন তাকে পথ করে দিল। ক্ষীণ গোঙানি ভেসে আসছে না!

দৃশ্যটা এই রকম: একটি সদ্য চল্লিশোর্ধ্ব মহিলা এবং বছর চোদ্দো মেয়ের ছিন্নভিন্ন পোশাক, প্রায় নগ্ন পড়ে আছে, হতচেতন। মেয়েটির মুখ দিয়ে অস্ফুট গোঙানির শব্দ উঠছে। দু'জনেরই কান রক্তারক্তি, ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে গয়না। ভদ্রমহিলার হাতও ক্ষতবিক্ষত। সেখানেও কিছু ছিল। স্টিলেটো পরা এক পায়ে। মেয়েটির রিবক রক্তে ভিজে চুপচুপে।

কাছাকাছি ঝোপে এক ভদ্রলোকের অর্ধমৃত দেহ পুলিশই আবিষ্কার করে। তিন জনকেই কাছাকাছি নার্সিং হোমে পাঠানো হয়। ভদ্রলোক রাত্তিরেই কোমায় চলে গেলেন। তাঁর মাথার পেছনে মারাত্মক আঘাত। ভদ্রমহিলা তিন দিন যুঝে লড়াই শেষ করলেন। মেয়েটি বেঁচে গেল। তবে, সে কাউকে চিনতে পারছে না। হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে উঠছে।

কাগজপত্র থেকে আবিষ্কার হল ভদ্রলোক এক নামী কোম্পানির উচ্চপদস্থ মানুষ। শৈবালসাধন গুপ্ত। স্ত্রী সাহানা গুপ্ত ডাক্তার। ইনিও বেশ কয়েকটি সংস্থার নিজস্ব ডাক্তার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। মেয়েটির নাম মিলি। সে একটি নামী স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ত। কিন্তু এঁদের কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে কলকাতা শহরে পাওয়া গেল না। খবর সংগ্রহ হল, সাহানার দুই ভাই অস্ট্রেলিয়ায় সেটল্ড। শৈবালসাধন একমাত্র সন্তান। বাবা-মা গত। বাবাও খুবই উচ্চপদস্থ ছিলেন। মাসতুতো-পিসতুতো ডিরেক্ট কেউ নেই। এক থার্ড কাজিন দম্পতি অনেক সাধ্যসাধনার পর পুলিশের গুঁতোয় এলেন। আমতা আমতা করে যা বললেন বোঝা গেল, গুপ্ত দম্পতিটি একটু হাই-ব্রাও গোছের ছিলেন। মধ্যবিত্ত আত্মীয়দের সঙ্গে তেমন আসা-যাওয়া ছিল না।

কাগজে দীর্ঘ দিন এই খুন ও ধর্ষণের বিবরণ ও সেই নিয়ে চিঠিপত্র চলতে থাকল। কিন্তু দিনের শেষে দেখা গেল মিলি নামের মেয়েটির দায়িত্ব নিতে কেউ নেই। স্কুল হস্টেলে রাখার কথা হয়েছিল। প্রিন্সিপ্যাল বললেন— একটি রেপ-ভিকটিমকে হস্টেলে জায়গা দিয়ে অন্য বোর্ডার দের মানসিক স্থৈর্য নষ্ট করার ঝুঁকি তিনি নিতে পারবেন না, অধিকারও তাঁর নেই। অভিভাবকদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি দুঃখিত।

—তা হলে আর কী? আপাতত সরকারি হোম।
শশাঙ্ক বলল— না।

চেষ্টা চরিত্র করে নার্সিং হোমের মেয়াদটা বাড়ানো হল। কিন্তু সারা কলকাতা ঢুঁড়ে এ রকম মেয়ের জন্য কোনও আশ্রয় ও চিকিৎসার কেন্দ্র পাওয়া গেল না। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বন্ধ বাড়ির চাবি খুলল। এক জন সর্ব সময়ের নার্স নিযুক্ত হল। ব্যস এর বেশি আর কী? মেয়েটির কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা অবশ্যই শশাঙ্কর। সে নানা কাজে ব্যস্ত। মোটরবাইকের সূত্র ধরে চার মস্তানের খোঁজে পুলিশ কতটা এগোল, আর এক দিকে আইনি পরামর্শ। মেয়েটি মাইনর। তার

কোথায় কী আছে, বাবা-মা'র ইনসিওরেন্স, তাঁদের টাকাপয়সা, সাকসেশন সার্টিফিকেট। নানান ঝামেলা। একটা নিজস্ব অ্যাকাউন্ট আছে তার। তাতে দেড় লাখের ওপর টাকা জমা রয়েছে ওইটুকু মেয়ের নামে। কী করত ও এত টাকা? বাবা-মাই রাখতেন নিশ্চয়। ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি? না শুধুই আদর? যাই হোক এটাই আপাতত তার একমাত্র ভরসা।

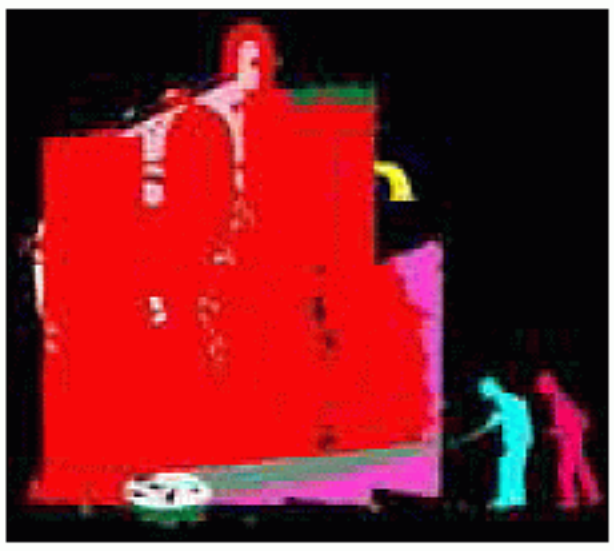

ব্যস্ততা আর বিপন্নতা যখন ক্রমশই বেড়ে চলেছে, নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠেছে, সেই সময়ে জামসেদপুর সাকচি থেকে ফোন এল।— চিনচিন আমাকে মা বলে ডাকছে দাদা, ও ভাবছে আমিই ওর মা। ছেলেটা যে কী মায়াবী, কী মিশুকে ভাবতে পারবেন না। আমাদের এখানে সবাই ওকে নিয়ে মুগ্ধ। আমি কি ওকে কোনও ভাবে দত্তক নিতে পারি?

কঙ্কণা চিনচিনকে দত্তক নিতে পারে কি না সে কথা শশাঙ্ক কী করে বলবে? বলতে পারে লোটন। কঙ্কণা কেন তার স্বামীকে একটা লং ডিসট্যান্স কল-এ ডেকে জিজ্ঞেস করছে না? এই পরামর্শ ছাড়া আর কী বলতে পারে সে কঙ্কণাকে? এরই মধ্যে চিঠি এসেছে, মোটা পার্সেল ক্যুরিয়ারে কার্তিক সামন্তর কাছ থেকে।

—বহু কষ্টে গোপনে এই পত্র পাঠাইলাম। বাবাজি, স্বহস্তে লিখিত এই ইচ্ছাপত্রও সঙ্গে দিলাম। স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি যা আমার নামে আছে তা অতঃপর চিনুর হইবে। ইহারা এখনই নিজেদের নামে ট্রান্সফার করাইতে চাহিতেছে। পুত্রটি ছিল আমার বয়সের, অনেক সাধ্য-সাধনার, দোকানগুলিতে কর্মচারী রাখিয়াছি। ইহাদের তাহা পছন্দ নয়। সোজাসুজি কিছু করিতে পারিতেছে না। দেহে মনে ভাঙিয়া গিয়াছি। কিন্তু যাহারা আমার পুত্র-পুত্রবধূকে খুন করিল, আমার নাতিকে আমার কাছ হইতে কাড়িয়া লইল, হরে-দরে তাহাদের কোনও না কোনও সময়ে শাস্তি দেখিয়া যাইব। আমি থাকিয়া থাকিয়া গর্জিয়া উঠি, খুনের কিনারা করো, বলাই নিতাই তোমাদের দাদা বউদির, আদরের ভাইপোটির খুনের কিনারা করো। উহারা কুঁকড়িয়া যায়। তোমাকে সহি করা চেকবই, পাসবই পাঠাইলাম। ইনভেস্টমেন্ট শেয়ার সকলই লকারে আছে। চেকে টাকাগুলি তুলিয়া লইও। যাহা লকারে আছে কোনও সুযোগে বাহির হইয়া হস্তান্তর করিব। ফোনে চিনুর খবর পাইয়াছি। তুমি এ-ধার মাড়াইও না। বড় ভাল হয় তোমার ভ্রাতৃজায়াটি যদি চিনুকে আপন সন্তানের সহিত মানুষ করে। আমি তাহাকে রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার উপর আমার কোনও দাবি নাই। ভাবিও না বুড়া নিজের দায় তোমার উপর চাপাইতেছে। আর্থিক ভার সকলই আমার। শুধু শপথ করো চিনুর স্বার্থ নিঃস্বার্থ ভাবে দেখিবে।

নূহর নৌকা

বাণী বসু

জালের মায়া মায়ার জাল

সে যেন এক শক্তিহীন মাকড়সা। তার চার দিকে তার নিজেরই কার্যকলাপ থেকে শুঁড় বার হয়েছে সুতোর মতো। তাকে কেন্দ্রে রেখে একটা জাল বোনা হয়ে যাচ্ছে। সে আটকে যাচ্ছে। ভীষণ ভাবে আটকে যাচ্ছে। একটার পর একটা দায়। শশাঙ্ক চিঠি উইল এ সব নিয়ে বসে থাকে। কী কর বে সে এখন? এ সব তো মহা ঝামেলার ব্যাপার। বসে থাকতে থাকতে সে টের পায় দীর্ঘ দিনের অনিয়মে তার শরীর বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে। অথচ, জলটাও যে নিয়ে আসতে হবে, এ ইচ্ছে নেই। পাশের ফ্ল্যাটের কথা ভাবে, ওহ্ ওটা তো তালা বন্ধ। সে তো বেল টিপে বলতে পারবে না কঙ্কণা, তোমার কাছে কিছু, মানে খাবার দাবার আছে? যদি অসুবিধে না হয়... শরীর মন পকেট। এ সব যত ক্ষণ ঠিকঠাক আছে তত ক্ষণ মনে হয় আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কারওর দরকার নেই। ইচ্ছেমত কাজ করব, ইচ্ছেমত ভোগ করব। সবটাই চলবে আমার মর্জিমাফিক। যেমন ভেবেছিলেন শৈবাল সাধন ও সাহানা গুপ্ত। বিপদের দিনে এক জন আত্মীয়কেও পেলেন না। ভেবেছিলেন কার্তিক সামন্ত ও তাঁর ছেলে তারক সামন্ত। জ্ঞাতিদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখেননি। ঠিক যে নেই, লোভ ক্রমশ বিকট চেহারা নিচ্ছে বুঝেসুজেও তো নিশ্চিন্তে ছিলেন। আজ বৃদ্ধ একা, নাতি সম্পূর্ণ অনাত্মীয়র দয়ার ওপর নির্ভর। সেও তো ভেবেছিল, বেশ আছে। ঝাড়া হাত-পা, যা ভালবাসে তাই করবে, যেখানে সেখানে খিদে পেলে খেয়ে নেবে। বাড়িতে এসে একটা বিছানা পেলেই তো হল। এখন কী রকম ঘোর লাগা আবছা চোখে সে দেখল, বাড়িটা অকথ্য নোংরা। ধুলো জমে আছে। বিছানাটা চিট ময়লা। তার চার পাশে খালি অযত্ন, অবহেলা, নোংরা। এক মহানারকীয় রাতের মধ্যে সে ঢুকে যাচ্ছিল ক্রমাগত। ছেড়ে দিয়েছিল নিজেকে। ঠিক আছে, তাই হোক। চেতনার মধ্যে শুধু জেগেছিল মা বাবার র ক্তাক্ত মৃতদেহ, মাফিয়া চক্রে খুন, একলা, সম্পূর্ণ একলা লড়াই। ভাই সুদূরের, কোনও দিন কাছে এল না, এবং ক্রূর স্বার্থপর মুখ সব মসৃণ মুখোশের আড়ালে। খালি খুন জখম, ধর্ষণ, দাঙ্গা, অগ্নিকাণ্ড, মানববোমা, বিশাল বিশাল মাপের চৌর্য পাবলিক মানির, জিঘাংসা, বুভুক্ষা, লিপ্সা ওহ্ একটা উন্মত্ত পৃথিবী তার মাথাময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। এইই তো নরক! সে তা হলে যাচ্ছে নরক থেকে নরকান্তরে? ঠান্ডা একটা হাত সে এক সময়ে অনুভব করল কপালে। শীতল, বরফ ঠান্ডা। শিউরে উঠল গাটা, নরমও। এই তবে মৃত্যুর হাত! এ তো ভালই। মৃত্যুকে কেন এত ভয় পায় লোকে?

কেউ যেন ডাকল, আংকল! কাকু! কিন্তু মৃত্যু তাকে কেন আঙ্কল টাঙ্কল কাকু টাকু বলতে যাবে? তার পর এক জন একটু বয়স্কা এবং এক জন কিশোরী তাকে জলে চুবিয়েছে, ডাক্তার ডেকেছে, তাকে হাসপাতালায়িত করেছে, সে কিছুই জানতে পারেনি। জ্ঞান ফিরল কোনও আপাত পরিচ্ছন্ন টিপটিপ ঘরে। আরে! এ তো একটা টিপিক্যাল নার্সিং হোম! যেন চেনা চেনা....

—এই তো, চোখ চেয়েছেন, এক জন সিঙ্গার এসে হেসে বললেন। বি পি, হার্ট বিট, পালস সব যথারীতি। স্যালাইন ঠেলা রয়েছে এক দিকে।

—ভাল আছেন? শরীরের দিকে একটু নজর দিতে হয়! যতই কাজ থাক। শরীরের নাম মোটেই মহাশয় নয়, বুঝলেন? সব সয় না।

ব্রেকফাস্ট এসেছে। কলা, পরিজ, ডিম, টোস্ট, দুধ।

—খান ভাল করে। অনেক দিন খান না। আপনারা এই ব্যাটাছেলেরা সত্যি কোনও দিন কিছু শিখবেন না। ওইটুকু একটা মেয়ে যা পারে, আপনারা জোয়ান মানুষ কেন যে....ভদ্রমহিলা কথা শেষ করলেন না। তার মনে হচ্ছে সে দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে এসেছে। গোগ্রাসে খেল। খেতে খেতে ভাবল এই গোগ্রাসে খেতে চাওয়াই তা হলে জীবনের লক্ষণ! কতকগুলো শারীরবৃত্তীয় বোধ। শুধু তার তাড়না, তার ভজনা, তার প্রশমন। এইই কি সব?

খাওয়া দাওয়া হয়ে যেতেই একটা অখণ্ড শান্তি তৈরি হতে থাকে ভেতরে, কোনও দুঃখ নেই, চিন্তা নেই, সমস্যা নেই। দেবতা জাতীয় কেউ যদি সত্যিই থাকে তা হলে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এই রক ম প্রসন্নতা বিরাজ করে। আরামে চোখ বুজল সে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুনল, কাকু! কেবিনের দরজা আলো করে দাঁড়িয়ে আছে একটি বছর চোদ্দোর কিশোরী মেয়ে। চুলে পনিটেল, আলোর মতো ফর্সা, অনাবিল চোখ। মিলি এখানে কী করছে? তার পেছনে মায়া নামে নার্সটিকে সে চিনতে পারছে। একেই সে মিলির তত্ত্বাবধানে রেখেছে। ওরা ঢুকতে না ঢুকতেই ঢুকল অতুলদা।

—যা হোক একখানা দেখালে শশাঙ্ক।

সে বলল, ফ্ল্যাটের দরজা খুললে কী করে?

আরে, আমাকে একটা কল দিয়েছিলে। ভুলে মেরে দিয়েছি। ইতিমধ্যে মিলির ফোন। শশাঙ্ককাকু অনেক দিন আসেনি। কেন? তখন খেয়াল হল অফিসেও তো আসছ না। কী যা রাগ করছিলেন! একটা ফোন করবার সৌজন্যও নাকি তোমার নেই, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে তুমি এতই ব্যস্ত। তোমাদের দারোয়ানের কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবি জোগাড় করি। ওহ্ শশাঙ্ক আই'ভ নেভার সিন সাচ আ মেস।

মিলি হঠাৎ শশাঙ্কর বেডের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এই মেয়েটিকে এ ভাবে কাঁদতে দেখেনি শশাঙ্ক তার চূড়ান্ত সর্বনাশের পরও। শক্ত ধাতের মেয়ে। সে বিষাদপ্রতিমা হয়ে গিয়েছিল, আর নয় তো রাগ করত, প্রচণ্ড অহেতুক ক্রোধ। যা পাচ্ছে ভেঙেচুরে দিচ্ছে। দিনের পর দিন শশাঙ্ক তার কাউন্সেলিং করিয়েছে। তার তত্ত্বাবধান করেছে বাড়িতে এই মায়া মহিলাটিকে সর্বক্ষণের জন্য রেখে। চার মস্তানের বিরুদ্ধে কেস উঠেছে এখন। এক জন শিল্পপতির ছেলে। এক জন টিভি সিরিয়ালের অভিনেতা, এক জন মন্ত্রীর ভাইপো আর চতুর্থ জন এক আই পি এস অফিসারের ছোট ভাই। এই কেসের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তার বিশ্রাম নেই। নিজের কাছে এমন প্রতিজ্ঞাই তো সে করেছিল। মানসিক বিপর্যস্ত মেয়েটিকে আদালতে নিয়ে যেতে ডাক্তারের বারণ আছে। তাই সমস্ত পদ্ধতিটাই স্থগিত হয়ে রয়েছে। তারা তিন জনকে পরিষ্কার শনাক্ত করতে পেরেছে। চতুর্থ জনের জন্যে মিলিকে দরকার। অথচ, সেটাও একটা বিপজ্জনক অভিজ্ঞতা হবে মেয়েটির পক্ষে। সেই যাকে বলে, আদালত ও একটি মেয়ে। এখন আবার ও কাঁদতে শুরু করল।

—তুমি কাঁদছ কেন?

—তুমি চলে যেও না, মরে যেও না, কাকু। আই হ্যাভ নো বডি টু টার্ন টু।

—আমি কোথাও যাব না। সে তার অনভ্যস্ত হাত মিলির মাথার ওপর রাখল। দিদি বা বোন। মা বা মেয়ে। কোনও নারী জাতিয়র সঙ্গে তার সংসর্গ কই? আবেগের বন্ধন কই? আত্মীয়তা? তাও তো নেই।

হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল কালো চুলে ঘেরা শ্যামলা একটা মুখ। খুব ঢলঢলে। শহুরে চটক নেই, গ্রাম্য আনাড়িপনাও নেই একদম। ফড়ফড় করে কথা বলার পাত্র নয়, যা বলে করে সবই সুচিন্তিত। ভদ্র, বাড়াবাড়ি নেই কোনও। এবং সে কাজ বোঝে। এক্ষুনি কী করা দরকার চকিতে বুঝে ফেলে সেটা। যত দূর মনে পড়ছে খুব ঠিকঠাক করে সেটা বার বার।

সকালের ভিজিটিং শেষ হয়ে যাবার পর সে তাই সিস্টারকে দিয়ে সাকচিতে একটা কল করাল।

—কঙ্কণা আছে?

—কে মৃগাঙ্ক? হ্যাঁ বাবা, ডাকছি।

—আমি মৃগাঙ্কর দাদা।

ও দিকটা কিছু ক্ষণ নীরব। এই নীরবতার অর্থ অনুধাবন করবার সময় নেই শশাঙ্কর। কিছু ক্ষণ পর কঙ্কণার গলাটা ও দিকে বাজতেই সে বলল— তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারবে? ধরো কালই?

—পারব!

সে আর কিছু বলল না। কঙ্কণাও আর একটিও প্রশ্ন করল না।

—কী দরকার! কী এমন হল? সে কেমন আছে। বাচ্চাটার খবর, মৃগাঙ্কর খবর! কিচ্ছু না। আশ্চর্য অল্প কথার মানুষ এবং কোন মানুষ ঠিক কেমন, কোনটা তার খুব জরুরি, এ সব দরকারগুলো সে চট করে বুঝে ফেলে। এই ভাবে কঙ্কণার বিশ্লেষণ সে কখনও করেনি। সেও তো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মানুষ। তাই দিয়েই বুঝে ফেলে অর্ধেক। আজকে প্রথম ভাল করে ভাবল, বুঝল। বিকেলেই ছাড়া পেয়ে যাবে। বাড়িতে গিয়ে তার প্রথম কাজ হবে লোটনকে ফোন করা।

অতুলদা একেবারে ছুটির দরখাস্তটায় সই করিয়ে নিল। বলল
— আমি তোমাকে কাছাকাছি কোথাও থেকে একটু সুপ এনে দিয়ে যাচ্ছি। টোস্টটা তুমি যদি ম্যানেজ করতে না পারো তো আমি নাহয় আর একটু বসেই যাই। বাই দা ওয়ে, একটা লোক টোক রাখো না কেন?
—রেখেছি অনেক বার। দরজা খোলা না পেয়ে চলে যায়।
হা হা করে হাসল অতুল
— আরে বাবা, দরজা খোলা না পেলেও মাইনেটা তো পায়।
—তা পায়। তবু টেকে না।
—এ ব্যবস্থা চলতে পারে না। সদ্য হাসপাতাল ফেরত রোগীকে নিজে টোস্ট করে খেতে হবে! দিস ইজ টু মাচ।
—কিন্তু এটাই তো সিচুয়েশন, অতুলদা। আমি ও সব ভাবি না। ওগুলো প্রবলেম নয়।
—তোমার প্রবলেমগুলো কী জাতীয় আমি আন্দাজ করতে পারি শশাঙ্ক, অতুলদা হাসল।
— কিন্তু টিকে থাকাও তো দরকার! টোস্টার রয়েছে দেখলুম। করবে তো? না, পেটে কিল মেরে রাতটা কাটিয়ে দেবে?
—আজ কি তোমার আর কোনও অ্যাসাইনমেন্ট আছে?
—নাঃ, তবে কাল ফার্স্ট আওয়ার।

অতুলদা সুপ ফুপ আনতে চলে গেলে শশাঙ্ক হঠাৎ আবার খুব ক্লান্ত বোধ করল। পাশ ফিরে ক্লান্তির হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া আর কিছু নেই এখন। রিল্যাকসেশন। বেশ কিছু ক্ষণ ডিপ ব্রিদিং করো, তার পর নিজেকে ছেড়ে দাও। এ ভাবেই যদি নিজেকে চাঙ্গা করা যায়! এখন মাথার মধ্যে কিচ্ছু নেই। এত অবসন্ন, একলা, প্রায় অসহায় তার কখনও লাগেনি। সেও কি জীবনভর এক অন্তর্নিহিত ট্রমায় ভুগছে না? লোটনকে অব্যাহতি দিতে গিয়ে নিজের ওপর দু'জনের চিন্তার ভার তুলে নেয়নি কি? ক্ষয় তো ভেতরে ভেতরে চলছেই। কাজ না থাকলেই সেই অনুভূতিটা চেপে ধরে। সে ঘুমিয়েই পড়েছিল। উপর্যুপরি বেলের আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। অতুলদা এল বোধহয়। কিন্তু দরজা খুলে দিয়ে শশাঙ্ক দেখল কঙ্কণা দাঁড়িয়ে আছে। তার কোলে একটি লাজুক শিশু। হাতে একটা বাস্কেট।

—তুমি? এর মধ্যে?
—কত ক্ষণ লাগে? আপনার কী হয়েছে? হসপিটাল থেকে ফোন?
—ও কিছু না।
—আপনার তো কিছুতেই কিছু না। ইশশ্ কী করে রেখেছেন! যাক পরে শুনব। আমি আসছি। চিনচিনকে একটু খাইয়ে আসছি। দরজাটা বন্ধ করবেন না।
পেছন থেকে অতুল বণিক বলল, আচ্ছা! আপনি এসে গেছেন! ভাইয়ের মিসেস না? বাঃ টোস্টের সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল।
অতুল ভেতরে এসে টেবিলে রাখল সুপটা। একটা প্লাস্টিকের মুখবন্ধ কৌটোয় দিয়েছে।
— তা হলে আমি আসছি শশাঙ্ক।
—শুনুন শুনুন। কঙ্কণা ডাকল। কী ব্যাপার বলুন তো। কী হয়েছিল এঁর? হসপিটাল থেকে ফোন গেল!

—আরে, সে মহাভারত! দু'দিন জ্বর টরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। মিলি আর আমি দু'জনেই এসে পড়ি ভাগ্যিস! প্র্যাকটিক্যালি মিলি আর মায়া মিলেই....। হাসপাতাল....স্যালাইন....দিন পাঁচেক ছিল। আরে, এর একটা বিয়ে দিন। বাউন্ডুলে হয়ে জীবন কাটে ম্যাডাম?
অতুল নিশ্চিন্ত হয়ে কেটে পড়ল।
কঙ্কণা অবাক হয়ে বলল, মিলি কে? মিলি, মায়া?
—সে অনেক কথা। ক্লান্তি আচ্ছন্ন করছে শশাঙ্ককে। সে ও পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। কারও কাছে কোনও জবাবদিহির শক্তি এখন নেই।

কঙ্কণা চিনচিনকে মেঝেতে ছেড়ে দেয়। সামনে তার প্রিয় প্লাস্টিকের বিল্ডিং ব্লক। আপন মনে খেলছে। কঙ্কণা বসেই থাকে, বসেই থাকে। এ কেমন মানুষ যে অন্যের বিপদে নিঃসঙ্কোচে তার কাছে পরামর্শ, সাহায্য চায়। নিজের বিপদে স্মরণও করে না? এরা খুব অদ্ভুত মানুষ, সত্যি! তার বাপের বাড়িতে মা বাবা ভাই আর বিবাহিত বোনে এই দূরত্ব নেই। এ তারা ভাবতেও পারে না। তার অসুখ করলে মা পাশে, বাবা ডাক্তারখানা, ভাই ওষুধ আনতে গেল। মায়ের কিছু হলে বাবার আর হাত পা আসে না। সে আর ভাইই তখন সব। বাবার কিছু হয় না চট করে। হলে সে সংসার সামলায়, মা রোগীর পাশে। ভাইটার অসুখ বিসুখ করে না। কিন্তু ফুটবল খেলে জখম হয় যখন তখন। সে সময়ে দিদি গরম গরম সেঁক দেবে আর সে আহা উ হু হু হু করবে এটাই নিয়ম।

মৃগাঙ্ক অবশ্য বলে থাকে, এগুলো আদিখ্যেতা। এই ধরনের গায়ে গায়ে ঘনিষ্ঠতা, নির্ভরশীলতা খুব গেঁয়ো ব্যাপার। আত্মনির্ভর হওয়াই উন্নত মানুষের লক্ষণ। কিন্তু মৃগাঙ্ক যদি একটি বার ফোন করে বলত, তুমি ছাড়া এই দেড় বছর প্রায় আমার যে কেমন করে কাটছে কাঁকন? কিংবা সেই যদি বলতে পারত কথাটা! আহ্ বড় আরাম হত। সোনা নয়, দানা নয়, দেশভ্রমণ নয়, সামান্য দুটো কথা মনটাই পাল্টে দিতে পারত! কিন্তু সে তো গেঁয়ো, এবং মৃগাঙ্ক প্রগতিশীল!

দাদার সেলফোনটা বাজল। চট করে কঙ্কণা ধরে সেটা। ঘুমটা না ভেঙে যায়। অতন্দ্র যে মানুষটাকে সে প্রতি দিন এক পায়ে খাড়া দেখে, আজ সে এমন অসময়ে যদি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সে ঘুম তার খুব দরকার।
—হ্যালো!
—আমি মিলি বলছি। কাকু বাড়ি ফিরেছেন? অতুলকাকু বলেছিলেন উনি রিলিজ করিয়ে নেবেন!
— হ্যাঁ, শশাঙ্কবাবু বাড়ি ফিরেছেন। অতুলবাবু পৌঁছে দিয়ে গেছেন।
—আমি যাচ্ছি মায়াদিকে নিয়ে। কাকুর এখন একা থাকা ঠিক নয় তো!

কঙ্কণা শুধু শুনছিল, মন্তব্য করছিল না। সামান্য চুপ। তার পর ও দিকের কণ্ঠটি বলল
— আপনি কে?
—আমি ওঁর ভাইয়ের স্ত্রী। ছিলুম না। এসে গেছি।
চুপ। তার পর আস্তে, তবুও। যদি আমরা যাই আপনি রাগ করবেন?
—না। তুমি চিনে আসতে পারবে?
—হ্যাঁ। গেছি তো এক দিন।

কঙ্কণা কোনও এক মিলি আর মায়াদির জন্যে বসে থাকে। মিনিট চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পর দরজায় বেল বাজে। কঙ্কণা খুলে দেখে লম্বা স্কার্ট পরা, ভারী ছেলেমানুষ মেম মেম দেখতে মেয়ে একটি বিগ শপার হাতে। পেছনে শক্তপোক্ত পেটা চেহারার নরম মুখের এক চল্লিশোর্ধ্ব মহিলা হাতে সুটকেস, রোল অন লাগেজ একটা।

শশাঙ্ক এখনও ঘুমিয়ে যাচ্ছে। রোগা, ফ্যাকাশে। মিলি সোজা তার ডিভানের কাছে এসে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েই থাকে। তার পর হঠাৎ কথা না বার্তা না, সে পেছন ফিরে কঙ্কণার কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। শব্দ বেশি নয়। কিন্তু অজস্র জমা জল ঝরছে।

চিনচিন খেলা থেকে মন উঠিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে বলল, দিদি কাঁদছে। মা, দিদি কাঁদছে। শশাঙ্কর ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে দৃশ্যটা। কঙ্কণার কাঁধে মুখ মিলির। মেঝেতে না মানো লাগেজ। মায়া চিনচিনকে কোলে নিতে হাত বাড়াচ্ছে। সে তড়াক করে উঠে বসল।

কঙ্কণা বলল, আপনি ও রকম হট করে উঠলেন কেন? কী রকম টলছেন! মায়া দাদাকে একটু শুইয়ে দাও তো! তোমরা বসো। আমি দাদার খাবার ব্যবস্থা করি। শশাঙ্ক কিছুই বুঝতে পারছিল না।

—এ সব কী? সে অস্ফুটে বলল।

—মিলিদিদি আপনার কাছে থাকতে এসেছে।

—কেন?

—ওখানে থাকতে পারছে না আপনার অসুখ শুনে।

—অসুখ হয়েছে, সেরে যাবে....এত সব....কোনও মানে হয়?

মিলি বলল, কাকু আমি এখানেই থাকব। ব্যস।

সারা দিন, সন্ধে অনেক ঘুমিয়েছে শশাঙ্ক। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে সে বলে উঠল, স্পার্টা স্পার্টা। তার পরেই একেবারে ভেঙে গেল ঘুমটা। স্পার্টা কেন? কেন বলে উঠল! সে কি কোনও স্বপ্ন দেখছিল? অনেক ভেবেচিন্তে তার মনে হল, সে আসলে চিন্তা ছাড়া থাকতে পারে না। ঘুরছে ফিরছে, মগজটা কিছু ব্যাখ্যা কিছু একটা বিষয় নিয়ে ভেবে চলেছে। সেই প্রক্রিয়াটা ভেতরে ভেতরে চলছিলই। শরীরের মধ্যে যন্ত্রগুলো তার বিগড়ে বসেছে। তাকে এক শীতার্ত পাহাড়ের সানুতে রেখে চলে গিয়েছিল তার বীর্য, তার স্বাস্থ্য, তার মানসিক ক্ষমতা, সব। অলস, শিথিল, ইচ্ছাশক্তিহীন অসহায়। অতুলদা তাকে টোস্ট করে নিতে বলেছিল। কিন্তু অসীম শৈত্য তার শরীর জুড়ে। সে পারত না এই সামান্য কাজও। ওই ঠান্ডা সুপটা গলাধঃকরণ করে শুয়ে পড়ত! মাঝর াতে প্রচণ্ড খিদে পেত। খানিকটা জল খেত। তার পর ঘুম না ঘুমের মাঝখানের অবসাদময়

অনুভূতি। আস্তে আস্তে নাঙ্গা পাহাড়ের কঠিন পাথর, খোলা ধারালো হাওয়া, শীত। ক্রমশ তুষার আবৃত করত তার দেহ, পর্বতারোহীদের পতন ঘটলে তো এমনটাই হয়! স্পার্টার নিয়ম পৃথিবী মানলে সে পরিত্যক্ত হত। কিন্তু মানেনি। ঘোর থেকে উঠে সে অতুলদা ও মিলিকে দেখল। হাসপাতাল, নার্স, মায়া। কঙ্কণাকে সে খবর পাঠিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু নিজের জন্যে নয়। মিলির জন্যে। প্রত্যাশার অনেক আগেই কঙ্কণা এসে গেছে। গরম রুটি করে দিয়েছে তাকে। আলু চচ্চড়ি যে এত চমৎকার একটা খাদ্য, সে তো আগে জানতই না। তাদের ধানবাদের বাড়িতে রোজ মাংস, মাটন বা চিকেনের চল ছিল। গরগরে তরকারি। এই আলু চচ্চড়ি তাকে যে কী এক নতুন জন্ম দিল! বেশ ভরপেট খেয়ে ঘুমিয়েছে সে। এখন ঘুম ভেঙে মনে হচ্ছে সে স্পার্টান সভ্যতার কেজো, প্র্যাকটিক্যাল, নিষ্ঠুর কঠিন নিয়মগুলোর কথা ভাবছিল। স্পার্টা হেরে যাচ্ছে, এই অঙ্কাংশ, এই দ্রাঘিমায়। এ তার কল্পনায় ছিল না। সে জানত, বাস্তব হল, সে একা। কল্পনাশক্তি, বুদ্ধি আজ অবধি শতকরা শতভাগ সে ব্যয় করেছে তার জীবিকার জন্য। নিরপেক্ষ, নিরুদ্বেগ, তথ্যসমৃদ্ধ, বুদ্ধিমন্ত পরিবেশনার জন্য সে সতীর্থ মহলে যথেষ্ট সমাদৃত। কিন্তু ওই পর্যন্ত। কল্পনা অন্য দিকে কাজ করেনি। আবেগও না। সে শিশুটিকে উদ্ধার করেছিল। তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল একটা চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানে। মিলি নামে কিশোরীটিকেও সে বাঁচতে সাহায্য করছে, আবারও চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানে। কিন্তু শিশুটি যখন তার ভাই বউয়ের কোলে চেপে ঘরে এল, মিলি যখন কঙ্কণার কাঁধে মুখ রেখে কাঁদল, আগেও তার হাসপাতালের শয্যায় মাথা রেখে কেঁদেছে, তখন সে বুঝতে পারছে একটা অন্য রকম ছবি তৈরি হচ্ছে। অন্য কল্পনার তৈরি। সে নিমিত্ত হয়ে রইল এই ছবির এবং ছবিটা এখন তাকে জড়িয়ে নিচ্ছে, সেও ছবিটার বিষয় হয়ে যাচ্ছে, রঙে কালিতে লম্বা গোল আঁচড়ে। সে বরাবর ছবির বাইরে ঘটনার বাইরে নিরপেক্ষ দাঁড়িয়ে থেকেছে। আজ সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

মিলি থাকে শশাঙ্কর ঘরে, কিন্তু সময় কাটায় কঙ্কণার কাছে। তার তো এখন স্কুল টুলের বালাই নেই। সে বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি থেকে তার প্রিয় বইগুলো নিয়ে এসেছে। দুঃখের বিষয় যাবতীয় কিশোরপাঠ্য রোমাঞ্চ তার বিষ লাগছে। সে কঙ্কণার, শশাঙ্কর বুককেস ঘাঁটছে। বাংলা পড়তে আটকাত। কঙ্কণার সাহায্যে সড়গড় হয়ে যাচ্ছে বেশ। তা ছাড়া, তাদের দু'জনকেই মোহিত করে চিনচিন দিদি আর মাকে নানান তথ্য জানাচ্ছে, যেমন টিট্টিটি খেলে। পিঁপড়ে ধুলো খায়। আরশুলা চিনি খায় শুঁড় নাড়ে। বলতে বলতে এক এক সময়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে, আতঙ্কে নীল হয়ে যায়। পোকা পোকা, গায়ে পোকা খাচ্ছে....। তাকে ভোলাতে বেশ বেগ পেতে হয় তখন। সে কথা বলতে শিখছে। দেরিতে। আটকে আটকে।

নূহর নৌকা

বাণী বসু

অফিস ও মানুষ

অফিসে জয়েন করেছে শশাঙ্ক। চিফ ডাকলেন।— বসো শশাঙ্ক, তোমার সঙ্গে কথা আছে।
— বলুন।
— তুমি যে আমাদের অ্যাসেট, সেটা জানো নিশ্চয়।
শশাঙ্ক চুপ করে রইল।
— তুমি অল্প কথার মানুষ। বিনয়ী না হলেও উদ্ধত নও জানি। কিন্তু এটা তো মানবে, তুমি সাংবাদিক!
— তা তো বটেই!
— তুমি আজকাল তোমার প্রাথমিক দায়িত্বটাকে একটা ট্যানজেন্টের মতো ছুঁয়ে বার হয়ে যাচ্ছ। সংবাদ কভার করতে গিয়ে এত ইনভলবড্ হয়ে যাচ্ছ কেন? ওই মেয়েটার কেসে পুলিশ যত না, তুমি তো তার চেয়ে বেশি গোয়েন্দাগিরি করলে। ক্রমাগত বুনো হাঁসের পেছনে দৌড়ে কত সময় নষ্ট করলে বল তো!
— সময় নষ্ট! আঅ্যাম ব্রিংগিং দা ক্রিমিন্যালস টু বুক।
— ঠিক। কিন্তু প্রমাণ সংগ্রহ, উকিল নিয়োগ, মেয়েটার কাউন্সেলিং, এগুলো কি তোমার দায়?
সে অবাক হয়ে রইল। বলতে ভুলে গেল চোদ্দো বছরের হতভাগ্য বালিকা, তার কোনও যাবার জায়গা ছিল না। কাউকে না কাউকে তো করতে হয়।
— কিন্তু দিনের পর দিন স্টোরিটা আমাদের বিক্রি বাড়িয়েছে। একটা ঘটনাকে প্রথম থেকে শেষ অবধি তাড়া করে গেছি তাই-ই তো স্টোরিটা এ ভাবে তৈরি হতে পারল!
— ডোন্ট মাইন্ড শশাঙ্ক। চিফ বললেন— আর য়ু রানিং আফটার দা গার্ল অর হার মানি?
শশাঙ্ক বজ্রাহত হয়ে বসে রইল।

— কী হল?
— আপনার কী মনে হয়?
— কিছু মনে হয় না। দিস ইজ নো অ্যালিগেশন। সম্ভাব্য মোটিভগুলোর কথা বললাম। উত্তর দেওয়া না দেওয়া তোমার ইচ্ছে।
— দেব। একটু ভাবি। ভেবে দেখি।

মোটিভ? সম্ভাব্য মোটিভ? মেয়ে? টাকা? ফিরতে ফিরতে ধূমকেতুর মতো এই প্রশ্ন তার লেজের আগুনে বিষ ঢেলে দিতে দিতে চলে গেল। কী চায় সে? কেন? অনেক ভেবেও একটা সঙ্কট এবং তার জন্য একটা তাৎক্ষণিক করণীয় ব্যবস্থা, এর চেয়ে বেশি সে কিছুই মনে করতে পারল না। ঘটনাচক্রে দুর্ঘটনায় পতিত দুটি বাচ্চাই ধনী। কিন্তু তাদের উত্তরাধিকারের কথা তো সে জানতই না। অনেক পরে জেনেছে। সত্যি কথা বলতে কী, সাংবাদিকতা করতে গিয়ে অমন বহু ধনী লোকের সংসর্গে তাকে আসতে হয়। জোচ্চোর, জালিয়াত, হামলাকারী, হুলিগান, এরা সকলেই লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার কারবারি। এরা যে তাকে নানা ভাবে ঘুষ-টুষ দিতে চায়নি, তা-ও তো নয়। ইচ্ছে করলে সে ধনী হয়ে যেতে পারত। সততার বিনিময়ে, নৈতিকতার বিনিময়ে। কত লোকেই তো হচ্ছে। ঠিক যেমন কত লোকে হচ্ছে খুনি, ধর্ষক, জোচ্চোর। সর কারি লোক জনগণের টাকা বেমালুম লুঠ করছে, বন্যাত্রাণের কোটি কোটি টাকা কী ভাবে নয়ছয় হয়ে যায়, আর্ত মানুষগুলির কাছে পৌঁছয় না। সে প্রত্যক্ষ দেখেনি, শুনেছে। প্রত্যক্ষ দেখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে কিছু না কিছু করতই। তার বাবাও করেছিলেন, কয়লার চোরা-কারবারি দের থামাতে চেয়েছিলেন। মা বলেছিলেন— চলো, এখান থেকে আমরা চলে যাই। বাবা বললেন— শশাঙ্ক, তোর কী মত? সবাই যদি করাপশন দেখে পালাই তা হলে শেষ পর্যন্ত কী হবে? শশাঙ্ক তো বাবার মতেই মত দিয়েছিল। খালি বলেছিল— তোমার রিভলভারটা সব স ময়ে কাছে রাখবে, কোম্পানির কাছ থেকে প্রোটেকশন দাবি করো। তা সেটা দেখা গেল যথেষ্ট হয়নি।

চিনচিনকে নিরাপদে রাখার দায়িত্ব তার দাদুই তাকে দিয়েছেন। তিনি যে ইচ্ছাপত্র, ব্যাঙ্কের পাশবই, চেক ইত্যাদি পাঠাবেন সে কি জানত? জানার পর, পাওয়ার পর এখনও পর্যন্ত সে তো টাকাটাও তোলেনি। উঁহু, টাকাটা তোলা দরকার। ভাল মনে করিয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক। র

াতদিন সে মৃগাঙ্কর টাকায় একটি অনাত্মীয় শিশুর ভরণপোষণ করবে? সে নিজেও দিতেই পার ত! কিন্তু চিনচিনের নিজস্ব টাকা আছে। তার দাদু দিচ্ছেন। তাকে অন্যের অর্থের ওপর অন্তত নির্ভরশীল করে রাখাটা অন্যায্য। আর মিলি? মিলির রক্ষণাবেক্ষণ, চিকিৎসার ব্যাপারে উদ্যোগটা তারই। একশো বার। কিন্তু মিলিও তো একটা বাচ্চাই। তার ওপর দিয়ে একটা দিনে যে তাণ্ডব হয়ে গেছে, তা তো প্রলয়ের চেয়েও ভয়ংকর। কেউ ছিল না তো ওর পাশে দাঁড়াবার। সে কী করে একটি ট্রমাগ্রস্ত নিঃসহায় বাচ্চা মেয়েকে ফেলে দিয়ে আসবে? যদি ওর বাড়ি-টাকা না থাকত! তা হলে শশাঙ্ক ওর চিকিৎসা করাত, রক্ষণাবেক্ষণ করত নিজের সাধ্য অনুযায়ী। এবং মূলত সে জন্যই সে আবারও কঙ্কণার শরণার্থী হয়েছে। তার বাবা-মার রক্তাক্ত মৃতদেহ সে যখন দেখেছিল, তার চব্বিশ বছর বয়স তখন। মিলির চোদ্দো, ঠিক দশ বছরের তফাত। সে আজও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। মিলি কি পারবে? কিন্তু না, এ ভাবে চলে না। এ তো সত্যিই ছেলে মানুষির শামিল।

বাড়ি ফিরে সে কঙ্কণাকে প্রথম কথাই জিজ্ঞেস করল— চিনচিনের ব্যাপারে লোটনের সঙ্গে কথা বলেছ?
— হ্যাঁ দাদা।
— তুমি কি বলেছ ওকে তুমি দত্তক নিতে চাও!
— না।
— কেন?
— মুখোমুখি কথা হওয়াই তো ভাল!

কঙ্কণার নিজস্ব কতকগুলো ধারণা ও পদ্ধতি আছে। মৃগাঙ্ক আসুক। একটা বাচ্চার কথা ফোনে শোনা, আর তাকে, তার লীলাখেলাগুলো সামনা-সামনি দেখার মধ্যে তফাত আছে। আসুক, দেখুক। মৃগাঙ্কর মন সে ভাল করে জানে না ঠিকই, কিন্তু চিনচিনের জাদুর ওপর তার বিশ্বাস আছে।

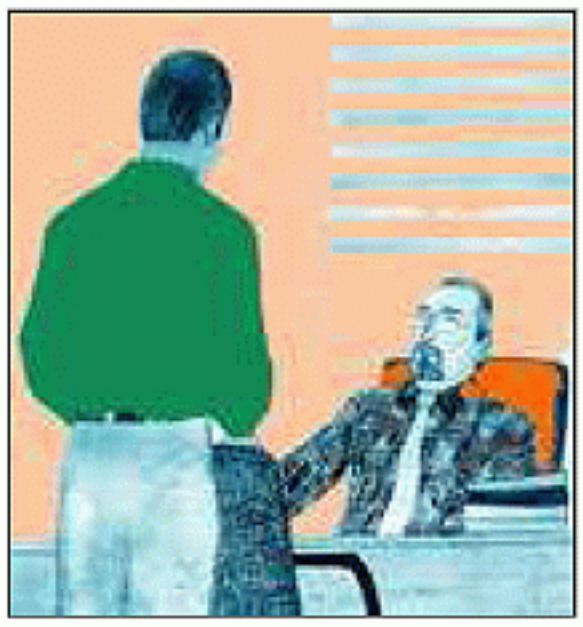

একমাত্র শিশুই পারে মানুষের কঠিন মনকে দ্রব করতে। কিন্তু, যে লোকগুলো তাকে কুয়োয় ফেলে দিয়েছিল, তারাও তো মানুষই ছিল? ওহ্ আজকেই সে কাগজে কতকগুলো পরিসংখ্যান দেখেছে। শতকরা কত জন শিশুকে অমানুষিক মার, অন্ন কেড়ে নেওয়া, হাড়ভাঙা খাটুনি, নির্যাতন, যৌন নির্যাতন সইতে হয়। একটি বাচ্চা মেয়ের ছেঁড়া ফ্রক পরা ছোট্ট ছবি, তার কষ্টবিকৃত মুখ তো আজই....! ওহ্, কী করে পারে? মা-বাবা সুদ্ধ খুন করছে, ছ্যাঁকা দিচ্ছে, মারণ প্রহার, বেচে দিচ্ছে, বিক্রি করে দিচ্ছে স্রেফ নিজের সন্তান!

কঙ্কণা মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে থাকতে থাকতে বুঝতে পারে কোথাও জল বাড়ছে। বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে জল। তবে কি কোনও আশা নেই? ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেবে সব ওই ঘোলা জল? ঘুমন্ত চিনচিনের অদ্ভুত মিষ্টি ফোলা ফোলা ঠোঁট আর চিকণ গাল, তার দেয়ালা দেখতে দেখতে সে তার মাথার ওপর হাত রাখে। বিশ্বের সমস্ত নির্যাতিত শিশুর জন্যে হঠাৎ তার দু'চোখ ফেটে অকূল জল ঝরে। সে আঙুল দিয়ে দেখায় ওদের—দেখো দেখো বাঘিনি কী রক ম শাবকের সঙ্গে খেলা করছে। হস্তিযূথ মাঝখানে কচিগুলোকে নিয়ে কেমন পার হয়ে যাচ্ছে

অরণ্য। একটা শালিকছানা মাটিতে পড়ে গেছে, বাচ্চাটার মা-বাবা সেখান থেকে নড়ছে না। কী করুণ ডানা ঝাপটানি! করো, তোমরা কিছু করো— সারা প্রকৃতিকে, পৃথিবীকে ডেকে ডেকে বলতে চাইছে যেন। এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতি শিশু দিয়েছে আমাদের মধ্যে স্নেহ ও করুণা জাগিয়ে রাখতে। এই জায়গায় অন্তত প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেও না তোমরা।

—কী করছ কাকিমা?
মিলির টিচার চলে গেছেন। অমনি মিলি লাফিয়ে এ ফ্ল্যাটে এসে গেছে। টিচার বলছেন ওর মনোযোগ নাকি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। কত মেধাবী মেয়ে ছিল।
— এই বারে রাঁধব।
— কী রাঁধবে?
— দেখি কী আছে।
— আমিও রাঁধব। আমায় শিখিয়ে দেবে?

আসলে, মিলি তার পরিচিত টেক্সট, পরিচিত রুটিনের মধ্যে তার বিভীষিকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে একটা যোগাযোগ ছকে ফেলেছে। ওগুলো দেখলেই তার সব মনে পড়ে যায়। ৩১ ডিসেম্বরের রাত, মোটরবাইক এবং এবং এবং!
তার সাইকি এই সব অনভ্যস্ত কাজ-কর্মে ভুলতে পারছে সে সব।
কঙ্কণা বলল— শিখবি বইকী! সবাইকে সব শিখতে হয়।
— তুমি লেখাপড়া শিখেছিলে?
— কেন আমাকে দেখে কি তোর মূর্খ মনে হয়!
— সো কল্‌ড লেখাপড়া, ডিগ্রি-টিগ্রি....
— আমি বি এসসি পাস করেছিলুম এককালে। খারাপ করিনি।
— সত্যি? তা হলে তো তুমিই আমাকে সায়েন্সটা দেখিয়ে দিতে পারো।
— পারি। কিন্তু কতটা ভাল পারব তা তো জানা নেই!
— পারতে হবে না। আমি পারব না। কিচ্ছু পারতে পারব না আমি। পারব না পারব না, হঠাৎ মিলি চিৎকার করে ওঠে—আমার মা-বাবাকে এনে দাও। দিতেই হবে, দিতেই হবে! ও মা! ও বাবা! চিৎকার করে কাঁদতে থাকে মিলি। মায়া ছুটে আসে। কঙ্কণা তাকে জড়িয়ে ধরে— মিলি মিলি, কাঁদ, কত কাঁদবি কেঁদে নে। কিন্তু এত আওয়াজ করলে চিনেটার ঘুম ভেঙে যাবে যে!

মন্ত্রবলে শান্ত হয়ে যায় মিলি। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে ফোঁপায়। এই আত্মসংবরণের ক্ষমতাটা তার এখন এসেছে। চিনচিন আর শশাঙ্ক, এদের কোনও অসুখ বা অসুবিধে হলে মিলি একদম স্বাভাবিক।

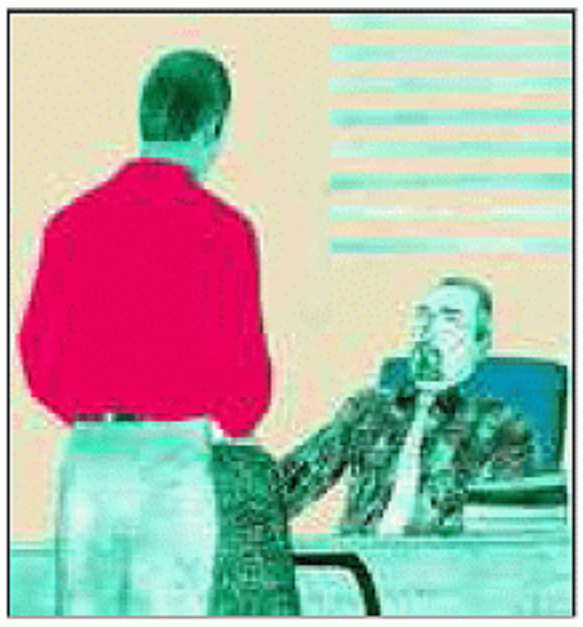

ফ্ল্যাটের দেওয়ালগুলো পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে। ব্যথার দেওয়াল। চিন্তার। মেঝেটা বলে ওঠে— আহা মেয়ে! আহা রে মেয়ে! পাখা চিকচিক করে চলতে চলতে বলতে থাকে— এর চেয়ে আমাকেই মানুষ করে দাও না হে। এই সামান্য ভূমিকাতেই তোমাদের কত আরাম দিচ্ছি, মানুষ হলে না জানি আরও কত পারতুম! দুপুরের কাক বলে— ক্যা? ক্যা? কে তোকে এমন করে কাঁদায় রে! অনুপমা হাউজিং-এর চত্বরে ঘাসগুলো খাড়াখাড়া হয়ে উঠেছে। আকাশে রোদ ঝিমিয়ে গেল, বাড়িগুলো অবসন্ন, একটি বালিকা আর্তনাদ করছে বলে ফেটে চৌচির হচ্ছে আকাশের সাদাটে ধূসর বুক।

কঙ্কণা ভাবে, আমিই সেই ভাগ্যবানদের এক জন, একমাত্র এখানে যার বাবা মাকে কেউ খুন করেনি, যাকে কেউ ধর্ষণ করেনি, যে অনাথ নয়, শোকে, দুঃখের ধাক্কায় যার মানসিক ভারসাম্য খানখান হয়ে যায়নি। যে এমন ভাবে নিঃসম্পর্ক অনাত্মীয় মানুষদের মর্জির ওপর নির্ভর করে বেঁচে নেই। এত দিন সে ভাবত, সে যাকে বলে ভাগ্যহীনা। ভুল বিয়ে, ভুল স্বামী, ভুল ঘর সংসার তার। আমার বাচ্চা নেই। সারা জীবন উষর, নীরস বেঁচে থাকব এমন করে। মৃগাঙ্ক পয়সা কামাতে যাবে, আমি পিশ প্যাশ কিংবা সাবুর খিচুড়ি রেঁধে খেয়ে নেব, খুব অনিচ্ছেয় শাড়িতে ট্রেসিং পেপার ফেলে ডিজাইন তুলব, তার পর রেশম বাছতে বসব। কোনওটাই আমাকে জীবন দেয় না। আনন্দ দেয় না। একমাত্র যখন সাকচিতে গিয়ে থাকি, কিছু দিন বাঁচি। কিন্তু সেও সীমাবদ্ধ, সময়বদ্ধ স্বর্গ। আবার ফিরতে হয় এই নিরানন্দ গৃহেই। কারণ এখানেই আমাকে রাখা হয়েছে।

নূহর নৌকা

বাণী বসু

প্রলয় সংকেত

মৃগাঙ্ক ঢুকে এল। রবিবার। সন্ধে সাড়ে সাত মতন। শশাঙ্ক দরজা খুলে অবাক।
—আরে, তুমি কখন?
—কাল রাত একটা নাগাদ।
—খবর-টবর দাওনি তো!
—অসুবিধে হল?
—না। অসুবিধে কী? শশাঙ্ক আশ্চর্য হয়ে বলল অসুবিধে তো তোমার। এত দিন বাড়ির বাইরে। হল? ট্রেনিং শেষ?

সে কথার জবাব দিল না মৃগাঙ্ক। ঠান্ডা স্বরে রাগ রাগ চোখে চেয়ে বলল—এ তুমি কী করছ দাদা?
—কী করেছি!
—আবার বলছ, কী করেছি! একটা পাগলি মেয়ে, একটা কার না কার ছেলে, গছিয়ে দিয়েছ আমার বউকে? বউটা তো আমার, না কী?

গালে নীলচে দাড়ির আভাস, খোঁচা মারছে একটু একটু। শশাঙ্ক গালে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ সে তো বটেই। কিন্তু ব্যক্তিটা তো কারও হয় না, নিজেরই থাকে। আমি কঙ্কণাকে জিজ্ঞেস করেই তো....
—রাবিশ!
—বাচ্চা আর মেয়েটির ভরণপোষণ আমি দেখছি লোটন। তোমার কিন্তু কোনও ক্ষতি নেই।
—লাভও কিছু নেই। কার না কার ছেলে একটা শুয়ে আছে আমার বিছানায় হাত পা মেলে।
—কার আবার ছেলে হবে! মানুষেরই ছেলে। তোমার ছেলে থাকলেও শুত!
—কে বলেছে তোমাকে আমার ছেলে হবে না?
—তা বলিনি তো! কঙ্কণা কি তোমাকে বলেছে ও বাচ্চাটাকে দত্তক নিতে চায়।
—বলেছে, আমি রাজি নই।
—কেন? পছন্দ হচ্ছে না? চিনচিন তো খুব লাভলি লোটন!
—তুমি বলছ ওর বাবা-মা নিকট আত্মীয়ের হাতে খুন হয়ে গেছে। খুন হওয়া লোকের বাচ্চা একটা। কী রকম স্টক বোঝাই যাচ্ছে।

শশাঙ্ক আস্তে আস্তে বলল লোটন, তা হলে আমরা? আমরাও তো খুন হওয়া মা বাবার...নিকট আত্মীয় না হলেও বখরাদারদের মধ্যে বাবার চেনাজানা, বিশ্বস্ত, খুব কাছের লোকও ছিল। তার চোখে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন শুধু। এবং প্রচ্ছন্ন যন্ত্রণা। কথার মধ্যে শুধু যুক্তি।
মৃগাঙ্ক দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

'অনুপমা'র ক্যাম্পাস মোটের ওপর বেশ বড়ই। এখানেই ওরা বেড়ায়। একটু খুঁজতেই শশাঙ্ক ওদের পেয়ে গেল। পুকুর, যেটাকে লেক নাম দেওয়া হয়েছে, তার পাড়ে সুন্দর ছোট্ট পার্কটার মধ্যে খেলছে চিনচিন। আরও কয়েকজন বাচ্চা। মায়াকে নিয়ে মিলি ও-দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কোনও দোকান টোকানে বোধহয়।

—কঙ্কণা শোনো!
—হ্যাঁ দাদা...
—শোনো, লোটনের এ ব্যাপারটা খুব অপছন্দ। আজ রাতে চিনচিনকে আমার কাছে দিয়ে যাবে। মিলি দেখবে। মায়াও রয়েছে।
কঙ্কণার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।—ও এই কথা বলেছে? সে ঢোঁক গিলল।
—হ্যাঁ। মানতে পারছে না।
—ঠিকই। বাড়ির কর্তা যখন ও। ওর টাকায় যখন খাই, ওর কথাটাই ফাইনাল।
—তা নয়।
শশাঙ্ক গলা নামিয়ে বলল—যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দু'জনে মিলে নেওয়াই ভাল।
—আচ্ছা! কঙ্কণার চোখ চিকচিক করছে
—ও যখন এই মাসে তিন হপ্তা টুর, রাত ১১/১২টায় বাড়ি ফেরার চাকরিটা নিয়েছিল আমাকে বলে নিয়েছিল নাকি? দূর তাও কখনও হয়! আমি একে মেয়ে, তার পর স্ত্রী, তার ওপর রে াজগার করি না। আমার কোনও পছন্দ-অপছন্দ, একা থাকার কষ্ট— কিছুই তো থাকার কথা নয়! দাদা আপনি এখনই ওকে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমি ছাড়া ও ঘুমোতে পারবে কি না সন্দেহ আছে। বাচ্চাটাও ও-দিকে ঘুমোবে না, আমিও এ দিকে জেগে থাকব। মাঝখান থেকে আমার সাড়ে সাত ঘণ্টার বর জমিয়ে ঘুমিয়ে নেবে।

কিন্তু শিশু কি কারও কথা শোনে? সে কি ভাবে এখন তাকে চুপ করে থাকতে হবে, এখন নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা দরকার! উপরন্তু দিদি দিদিই। খুব ভালবাসার মানুষ। কিন্তু দিদিকে মায়ের জায়গায় বসাতে তার বয়ে গেছে। সুতরাং, অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে ঘু ম পাড়িয়ে রেখে তবে কঙ্কণা বাড়ি যায়। এবং সকালে মৃগাঙ্ক বেরিয়ে যাবার পর কঙ্কণা আবার এসে বাচ্চাকে নিয়ে যায়, সারা দিন চলে তার পরিচর্যা এবং খেলা। তার সঙ্গে বকবক। চিনচিন এখন একটা রীতিমত চমৎকার গাবদা গোবদা মজাদার আদরকাড়া বাচ্চা। সব্বাই তাকে ভালবাসে। একমাত্র মৃগাঙ্ক ছাড়া। এবং প্রত্যেক দিন সকালে কঙ্কণার চোখ লাল থাকে।

মায়া রান্না করছে, মিলি ঘর গুছিয়ে রাখছে। শশাঙ্ক বাড়ি ফিরে প্রকৃত গৃহস্থের মতো তৈরি খাবার, পরিষ্কার ঘর, বোতলভর্তি জল, ধবধবে বিছানা পাচ্ছে। এরই মধ্যে মিলির সাক্ষ্য শেষ হয়ে গেল নির্বিঘ্নে। সে সমস্ত নীচ, কূট প্রশ্নের উত্তর দিল ঠিকঠাক। শশাঙ্ক তাকে তৈরি করার চেষ্টা করেনি, তাদের পক্ষের উকিল শুধু বলেছিল —তোমাকে কদর্য সব কথা বলবে মা, তুমি তাতে ভড়কে যেও না।

—কে তোমাকে রেপ করেছিল মা? গলায় মধু ঢেলে ও-পক্ষের উকিল বললেন।

—ওই তো... সে আসামির কাঠগড়ায় চার জনের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

—তুমি রেপ মানে ঠিকঠাক জানো তো?

—আমি রোজ কাগজ পড়ে থাকি।

—(হাসি) কাগজ পড়ে তো রেপ জানা যায় না মা। এই মানে চুমুটুমু খাওয়াকে কিন্তু রেপ বলে না। গায়ে হাতটাত দিলে মলেস্টেশন বলবে।

—আপনি হাসপাতালের ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করুন। কড়া গলায় প্রধান সাক্ষী বলে উঠল।

—ব্যাপারটা আসলে খুব ইন্টারেস্টিং, তোমার মতো বয়সের মেয়েরা আজকাল হামেশাই....

—অবজেকশন মি. লর্ড মিলির পক্ষের উকিল হেঁকে উঠলেন।

—ইনি মেয়েটিকে বিভ্রান্ত করবার, তাকে অপমান করবার চেষ্টা করছেন।

—অবজেকশন সাসটেইন্ড।

—আচ্ছা ঠিক আছে। নরনারীর সম্পর্কের কথা তুমি কতটুকু জানো?

—আমার মা আমাকে সব বলেছেন। বলতে বলতে তার ঠোঁট ফুলতে থাকে, সে চিৎকার করে ওঠে—

ওই সাইডবার্নওলা শয়তানটা আমার বাবার মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরেছিল প্রচণ্ড। বাবা পড়ে গেলেন। আমার মাকে ওই লোকটা, ওই যে দাড়িকামানো শয়তানটা টেনে নিয়ে গেল। আরও দুটো বদমাস ওই মোটাটা আর ওই লিকলিকে মতোটা আমাকে তুলে ধরে জোর করে একটা ফাঁকা কারখানা ঘরে নিয়ে যায়। আমার মার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমার ওপরেও। তিনটে বড় বড় লোক...ওদের লজ্জা করেনি! সাইডবার্নওলা লোকটাই আমার বাবাকে খুন করেছে। এই তিনটে লোক আমার মাকে খুন করেছে। ওদের শাস্তি দিন জজসাহেব। আমার কেউ নেই, আমার মা বাবা সবাইকে... মিলি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

আরও কিছু দিন সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করার পর সাইড-বার্ন অর্থাৎ মন্ত্রীর ছেলের মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল। অন্য তিন জনের যাবজ্জীবন। সুবিচার। শেষ পর্যন্ত সুবিচার। মিলিকে আগলে নিয়ে ঘরে ফেরে শশাঙ্ক। বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে। শূন্য বাড়ির কোণে ঘুরে বেড়ায় মিলি। চোখ শুকনো। জিনিসপত্র নাড়ে চাড়ে। শশাঙ্ক আস্তে বলে— মিলি এখানে এসে থাকবে?

ঝট করে পেছন ফেরে সে —তুমি থাকবে? কাকিমা থাকবে? চিনে? শূন্য বাড়িতে আসলে শুধু দুঃসহ স্মৃতি। মানুষ চাই, নির্ভর করার ভালবাসার মানুষ।

নৌকা

রাত প্রায় এগারোটা। পেরি মেসন বন্ধ করল শশাঙ্ক। বেড সুইচটা নিবিয়ে দিল। ও দিকে চিৎকার কেন! পাঁচ ইঞ্চির দেওয়াল। ও দিকে কঙ্কণাদের শোবার ঘর। দুমদাম, অর্ধস্ফুট চিৎকার, কী এ সব? শশাঙ্ক ছুটে যায়, উপর্যুপরি বেল দেয়। কেউ খোলে না। খালি নির্ভুল চিৎকার ভেসে ভেসে আসে ও দিক থেকে বাঁচাও বাঁচাও।

ছুটে নিজের ড্রয়ার থেকে ও-বাড়ির ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে তীব্র বেগে গিয়ে দরজা খোলে শশাঙ্ক। মৃগাঙ্ক দাঁড়িয়ে তার মুখোমুখি। লণ্ডভণ্ড কঙ্কণা মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছে। মৃগাঙ্ক বলল —ওহ্, দিস, এই ডুপ্লিকেট চাবি... এই ভাবেই তা হলে ঢুকতে, দিনের পর দিন এই ভাবেই লীলাখেলা চালিয়ে গেছ, দায়িত্বশীল চিরকুমার দাদা আমার। বাঃ! আমি থাকি না সেই সুযোগে বাচ্চাটা বানিয়েছ! এখন দত্তকের গপ্পো বানাচ্ছ শশাঙ্ক সরকার!

—কী বলছ লোটন! এ সব কী! এ সব তোমার মনে হয় কী করে?
—হোয়াট ইজ দ্যাট হোর অব আ গার্ল ডুয়িং ইন ইয়োর ফ্ল্যাট? ভালই চলছে। অ্যাঁ?
—লোটন শি ইজ আ উন্ডেড চাইল্ড, স্টপ দিস ননসেন্স।
—দাঁড়াও দেখাচ্ছি। মৃগাঙ্ক ছুটে যায় রান্নাঘরের দিকে। তার পরে হাতে একটা লম্বা ছুরি নিয়ে উন্মাদের মতো বেরিয়ে আসে।
—আগে শেষ করব এই বেশ্যাটাকে। তার পর দেখব কত বড় দাদা তুমি।
শশাঙ্ক এক লাফে গিয়ে তার কবজি চেপে ধরে।
—ছাড়ো ছাড়ো, ছাড়ো বলছি। কাম ব্যাক টু ইয়োর সেন্সেজ।

কে কার কথা শোনে! দু'জনে প্রাণপণে দু'জনের হাত পাকড়েছে। ছুরি এক বার বেঁকছে শশাঙ্কর দিকে, আর এক বার মৃগাঙ্কর দিকে। কঙ্কণা উঠেছে কোনও ক্রমে— ছাড়ো, ছাড়ো ফেলে দাও ছুরি। কী পাগলের মতো করছ! বলতে বলতে কঙ্কণা হঠাৎ টাল খেয়ে পড়ে যায় শশাঙ্কর পিঠের ওপর। মুষ্টিবদ্ধ ছুরি তখন মৃগাঙ্কর দিকে ফেরানো ছিল। আমূল বিঁধে যায় এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোয় তার হৃৎপিণ্ড দিয়ে। দরজার কাছে বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে মায়া, মিলি ও পাশের ফ্ল্যাটের কয়েকজন। চতুর্দিকে আলো জ্বলে উঠছে। কেয়ারটেকার ছুটে এসেছে। অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, হাসপাতাল এবং মর্গ। ছুরিটা পুলিশের হাতে চড়ে যেতে যেতে বলে গেল— ড্রয়ারে থাকতুম, মাঝে-মধ্যে মাংস কাটা হত, আজ জানলুম আমার জন্যও কোনও

গুরুত্বপূর্ণ কাজ জমা ছিল। দেয়ালগুলো পরস্পরকে ফিসফিস করে বলতে লাগল— সব সন্ত্রাসের এক দিন শেষ হয় তখনই, যখন নিজের হাতের ছুরিই অদ্ভুত কোণ তৈরি করে নিজের ই শরীরে বিঁধে যায়।

দীর্ঘ ছ'মাস কেস চলবার পর বেকসুর খালাস পেল তারা। প্রশ্নটা একটা সূক্ষ্ম সুতোর ওপর ঝুলছিল। শশাঙ্ক সম্পর্কে কারও কোনও সংশয় ছিল না। কিন্তু কঙ্কণার ধাক্কাটা? সে তো সেই চিরন্তন স্ত্রীলোক কিনা যে জন্ম ব্যাভিচারিণী। যে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে! আক্রমণকার ী অবশ্যই মৃগাঙ্ক। ছুরির হাতলে তার ছাড়া আর কারও হাতের ছাপ নেই। সাক্ষীও যথেষ্ট। কিন্তু স্ত্রী যে মাথা ঘুরে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ কী! প্রমাণ এই যে, তার দুই রগ ফুলে উঠেছে। মাথার চুল গোছা করে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে গায়ের জোরে। এবং সর্বাঙ্গে মারের ছেঁচা দাগ। দুই গালে পাঁচ আঙুলের ছাপ।

ভাসুর ভাদ্দরবউয়ের মধ্যে সম্পর্কের মুখরোচক গল্পটাও বাজারে ভালই চাউর হয়। ছেলেটি অবৈধ, এদের দু'জনের, প্রমাণিত হয়ে গেলে কেসটা সহজ হত বেশ। কিন্তু কার্তিক সামন্ত নিজেই কোর্টে এসে কবুল করে গেলেন, শিশুটি তাঁর নাতি। তার জীবনের আশঙ্কা ছিল তাই শশাঙ্ককে চুপিচুপি রাখতে দিয়েছিলেন। এই ভাবে এক কেসের পিছু পিছু কার্তিক সামন্তর ছেলে বউ খুনের ফয়সালা না-হওয়া কেসটি উঠে পড়ল। এবং তারও সুষ্ঠু সমাধান হয়ে গেল।

চিফ বললেন
—বসো শশাঙ্ক, তোমার সঙ্গে কথা আছে।
—বলুন।
—গৃহদাহর সময়ে সাংবাদিক যদি দমকল হয়ে পড়ে ছবিটা তুলবে কে? দুর্ঘটনার সময়ে অগ্রপশ্চাৎ না দেখে যদি সে ভিকটিমকে নিয়ে হাসপাতালে ছোটে তা হলে খবরটা পুঙ্খানুপুঙ্খ না-ও হতে পারে। কী ঠিক বলছি? সাংবাদিকে সমাজসেবী হলে চলে না। ঠিক তো?
—হুঁ।
—তোমার ক্ষমতায় আমার কোনও অনাস্থা নেই। তোমার জন্যে দু'দুটো কেস এই ভাবে সলভ্‌ড হল। কাগজের বিক্রি তিন গুণ হয়ে গেছে। সম্পাদক সমীপেষুতে বলছে, পুলিশের গোয়েন্দার চেয়ে খবরের কাগজের গোয়েন্দা অনেক অনেক নির্ভরযোগ্য। তুমি তো ইস্ট জোনের চিফ হয়ে যাচ্ছ। অনাস্থা তোমার ক্ষমতায় নয়, অনাস্থা তোমার আচরণে। বড্ড ইনভলভ্‌ড হয়ে পড়ছ। য়ু আর ম্যাড টু ডু দিস।
—চারটে মার্ডার, একটা অ্যাবডাকশন...শাস্তি পেল আট ন'জন ক্রিমিনাল...বলেন কী?
—হ্যাঁ, কিন্তু তার পরেরটা, যেটা তোমার নিজের ঘরে ঘটল! ডোন্ট মাইন্ড শশাঙ্ক। য়ু সিম টু স্টিক ইয়োর নোজ আউট ফর পিপ্‌ল হু আর ওয়েল এব্‌ল টু টেক কেয়ার অব দেমসেলভ্‌স!

কার কথা বলছেন ইনি? শিশুটি, যে কুয়োয় পড়েছিল? বালিকাটি, যে কারখানায় অর্ধমৃত মায়ের পাশে শুয়ে কাতরাচ্ছিল? না যুবতীটি, প্রচণ্ড প্রহারের পর যে মাংসকাটা ছুরির সামনে পড়েছিল?

সে বলল
—নাঃ। আর হবে না।
—স্টিক টু ইয়োর ডিসিশন ম্যান, ইটস নট হেলদি য়ু সি।
—আপনি একটু ভুল বুঝছেন সার, আমি চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি।
—বলছ কী? কেন? তোমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! এটা কি রাগ-অভিমানের সময়? আমি তোমাকে জাস্ট কতকগুলো বেসিক্স বুঝিয়ে দিয়েছি। প্রায়রিটিজ ইন জার্নালিজম!
—দ্যাটস অল রাইট। সে জন্যে না। এই চাকরিটা আমি আর করছি না।
—কোথাও বেটার অফার পেয়েছ?
—পেয়েছি। লট্স। নিচ্ছি না।
—কেন? আরে আমরা বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমার পে, তোমার পার্কস, য়ু ডোন্ট হ্যাভ টু বার্গেইন, আই হ্যাভ ডান দ্যাট ফর য়ু।
উঠে দাঁড়াল শশাঙ্ক
—এই নিন পদত্যাগপত্র। নো অফেন্স মেন্ট স্যর। আমার ভাল লাগছে না।
—ক্ কী করবে? কোথায় জয়েন করবে?
—জানি না। সত্যিই এখনও জানি না।

মানুষের পরিবার রক্তের সম্পর্ক মেনে তৈরি হয়। বাবা মা ভাই বোন। বাইরে থেকে যে মেয়েটি স্ত্রী হয়ে আসে পুরুষকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করার প্রক্রিয়া দিয়ে সে রক্তে রক্ত মেশায়। কিন্তু জীবনকে বিরাট ও সনাতন বলে দেখতে গেলে বোঝা যায় সব সমর্থ পুরুষই পিতা, সব নারীই মাতা, এবং সব শিশু বালক বালিকাই সমস্ত মানুষের পুত্র কন্যা। তাদের মধ্যে এই গূঢ় অনাদ্যন্ত সম্পর্ক কখনও কখনও দুর্ঘটনাচক্রে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। রক্তের সংকেত তখন সে অগ্রাহ্য করে, আর তখনই ভাবী কালের, আরও সুসভ্য সুসঙ্গত উন্নততর সমাজের সূচনা হয়।

তাই যখন জল বাড়ছিল আর বাড়ছিল, ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিল যত দূর দৃষ্টি যায় সমস্ত চরাচর, তখন সংকেতটা আমরা বুঝে ফেলি। সবাই মিলে খেটেখুটে তৈরি করি একটি নৌকা। অতঃপর তাতে তুলে নিলাম শস্যবীজ, চারা, খাদ্য, সব রকমের পশু পক্ষীর জোড়া এবং শিশু, বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ়া বৃদ্ধ জীবনের এই সব মূল আয়োজন। তার পর ঘোলা জলে ডুবিয়ে দিলাম দাঁড়, ছেড়ে গেলাম এই ডুবন্ত সভ্যতা।

আমার নামটি কঙ্কণা, আমার ছেলের নামটি চিন্ময়, মেয়ের নামটি রঙ্গনা আর আমাদের সেই তাহার নামটি শশাঙ্ক। আমরা পৌঁছই এক নিঃস্ব হতশ্রী গ্রামে। দত্তক নিই পুরো এলাকাটা। সবাইকে বুঝিয়ে সুজিয়ে চালু করেছি সমবায় কৃষি, খামার। ট্র্যাক্টর চলছে, প্রায় সবটাই জৈব সার। কাছের নদী থেকে নালা কেটে সেচ চলছে, বৃষ্টির জলও ধরে রাখি আমরা। আমাদের সেবাঘর, বিদ্যাভবন, কারিগরি বিদ্যালয় চালান তিনি। হিমঘর, চালকল, গমকলের দায়িত্বে আছেন আমার শ্বশুর কার্তিক সামন্ত ও স্থানীয় বিজ্ঞ মানুষ অক্ষয় মাজি, আমার আর এক শ্বশুর। আলুর পাঁপড়, চিপ্স, পোটাটো পাফ, টোম্যাটো সস, নানা ধরনের সুপ, মাশরুম এবং আরও সব রকম উদ্বৃত্ত ফসলের যাবতীয় প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্বে রয়েছেন মায়া দাশ বলে এক মহিলা। ইনি এবং গ্রামের কয়েকজনকে এ বিষয়ে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে। ডেয়ারির কাজকর্ম

দেখেশুনে এইমাত্র ফিরছি। ফিরছে আমাদের অনেক মেয়ে, অনেক পুরুষও। কাঁচা তরি তর কারির তিনটে ভ্যান, দুধের ভ্যান সব ছেড়ে গেল। ওরা এখন জাতীয় সড়কে উঠবে। জাতীয় সড়ক অবধি রাস্তাটা পাকা করেছি আমরাই। আমার মেয়ে আরও চারটি ছেলেমেয়ে ডাক্তারি পড়ছে। নার্সিং, ইউনিভার্সিটিতেও আছে অন্তত জনা দশেক। ডাক্তার নার্সের আমাদের খুব দর কার। না না, সরকারি সাহায্য আমরা নিই না তো! ফরেন ফান্ড! সর্বনাশ! না। যা যা দরকার শ্র ম এবং বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে আমরাই করে নিই। সড়ক ছাড়াও পরিষ্কার করা হয়েছে জলা, পুকুর, নদীর খাল। বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে খানিকটা। আষাঢ়ের প্রথম দিন না হলেও কোনও এক দিনে তার মাথায় যখন কাজলা মেঘ জমে, চার দিকের সবুজে আর আকাশের কালোয় মিলে বড় সুন্দর দেখায়। আমরা জৈব গ্যাস ও সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করছি। দেখতে চান? আসবেন? আসবেন বইকী! তবে বেলাবেলি চলেও যাবেন। আমাদের কোনও অতিথি নিবাস নেই তো! পর্যটন শিল্প মাথায় থাক। এটা আসলে আমাদের বাঁচার জায়গা। বিজ্ঞাপন নয়।

BDeBooks.com

BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com